একক ১ □ জ্ঞাপন

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য
১.১ প্রস্তাবনা
১.২ জ্ঞাপনের ধারণা
১.৩ মানবিক জ্ঞাপন
১.৪ জ্ঞাপনের সংজ্ঞা
১.৫ উপাদান
১.৬ জ্ঞাপনের কাজ
১.৭ জ্ঞাপনের ইতিহাস
১.৮ জ্ঞাপনের বিভিন্ন রূপ
১.৯ পারস্পরিক জ্ঞাপন
১.১০ অর্ন্তমুখী জ্ঞাপন
১.১১ দলগত জ্ঞাপন
১.১২ গণজ্ঞাপন
১.১৩ চিরায়ত জ্ঞাপন
১.১৪ সারাংশ
১.১৫ অনুশীলনী
১.১৬ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ উদ্দেশ্য

জ্ঞাপন বিষয়ে কিছু মৌলিক ধারণা দেওয়াই এই এককের লক্ষ্য। আপনারা পড়লেই বুঝতে পারবেন একে একে কীভাবে তুলে ধরা হবে মৌল কয়েকটি বিষয় যা জ্ঞাপন বিষয়টিকে বুঝতে সাহায্য করবে। যে বিষয়গুলি আলোচনা করা হবে সেগুলি হল ঃ

- জ্ঞাপনের ধারণা ও সংজ্ঞা
- কাজ
- জ্ঞাপনের বিভিন্ন রূপ
- উপাদান
- জ্ঞাপনের ইতিহাস

১.১ প্রস্তাবনা

জ্ঞাপন বলতে ঠিক কী বোঝায় তা আলোচিত হবে এখানে। বিশেষজ্ঞদের মতামত তুলে ধরে একেবারে যথাযথ রূপটি পাওয়া যাবে। তারপর জানা যাবে জ্ঞাপনের উপাদান, কাজ কী। প্রতিনিয়ত জ্ঞাপন বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে সমাজ জীবনকে সমৃদ্ধ করছে। জ্ঞাপনের ইতিহাসও চমকপ্রদ। তার পরিচয়ও দেওয়া হবে।

১.২ জ্ঞাপনের ধারণা

মানব জগতে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে জ্ঞাপন। মানুষ একে অপরের কাছে নিজেকে মেলে ধরছে। প্রকাশ করছে নিজ মনোভাবনা। এভাবেই ঘটে চলেছে মানবজগতের নিত্য জ্ঞাপন-ক্রিয়া। বেঁচে থাকার জন্য যেমন দরকার জল ও খাদ্য। ঠিক তেমনি মানুষের চাহিদা, অনুভব, ক্ষোভ, ভালবাসা ও আনন্দ প্রকাশের জন্য জ্ঞাপনের প্রয়োজন। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যেই রয়েছে জ্ঞাপনের তাগিদ।

জ্ঞাপনের ইংরেজি হল Communication। লাতিন শব্দ Communis থেকে এসেছে। Communis কথার মানে হল Common, অর্থাৎ সাধারণ। কেউ যখন কোন অনুভব, ভাবনা ও প্রতিক্রিয়াকে অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে সাধারণগ্রাহ্য করে তোলে, তখনই উদ্ভব হয় জ্ঞাপনের। প্রখ্যাত জ্ঞাপনবিদ Denis MacQuail বলেছেন 'Communication is a process which increases commonality'। একজন বলছে আর একজন শুনছে। পরস্পরের মধ্যে ঘটছে ভাব বিনিময়, বার্তার আদানপ্রদান। একজনের ভাবনা আর একজন ভাগ করে নিচ্ছে। ব্যক্তিভাবনা এভাবেই হয়ে উঠছে সাধারণগ্রাহ্য।

আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যেও এই সাধারণগ্রাহ্যতার প্রসঙ্গ রয়েছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে সাধারণীকরণের কথা বলা হয়েছে। রস অনুধাবনে এই সাধারণীকরণের ভূমিকা রয়েছে। একজন প্রকাশ করছিল এবং অন্যজন তা গ্রহণ করছেন, দু-দুজনকেই আসতে হবে সম-হৃদয়ের কাছাকাছি। তাহলেই শিল্পরসের ভাগাভাগি সার্থক হয়ে উঠবেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "একাকী গায়কের নহে তো গান গাহিতে হবে দুই জনে।" প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ রবিশংকরের কথায় "গানবাজনা একটা লেনদেনের ওপর চলে। শুধু যে বাজাচ্ছে তার ওপরই সবটা নয়। যে শুনছে তার ওপরও অনেকখানি নির্ভর করে।" শুধু শিল্পে নয়, প্রতিদিনের প্রাত্যাহিকতাতেও জড়িয়ে আছে দু-পক্ষের সমান অংশগ্রহণ। আর এই অংশগ্রহণ যদি সফল হয় তাহলেই সার্থক হয়ে ওঠে জ্ঞাপন।

জ্ঞাপন হয় প্রতীকের মাধ্যমে। এই প্রতীক ভাষা হতে পারে, ছবি হতে পারে, দেহের ভঙ্গীমা অথবা সুরও হতে পারে। যার প্রতি এই জ্ঞাপন হচ্ছে তাকে এই প্রতীকি ভাষা বুঝতে হবে। যে বার্তা পাঠাচ্ছে এবং যে গ্রহণ করছে, দুজনই জানবে এই ভাষা এবং এটা সম্ভব হলেই তৈরি হবে সেই পরিপ্রেক্ষিত যাকে ইংরেজিতে বলে Shared symbolic enviornment যার মধ্যে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক রচনা করে। একজন আর একজনের অনুভব ও ভাবনা বুঝতে পারে।

১.৩ মানবিক জ্ঞাপন

মানবসমাজের মধ্যে প্রতিনিয়ত এই যে ভাবনার আদানপ্রদান ঘটছে তাকেই বলা হয় Human Communication বা মানবিক জ্ঞাপন। Denis MacQuail মানব জগতের এই জ্ঞাপনকে মানবিক বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন অর্থবহ বার্তার আদানপ্রদানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় human communication। মানুষ শুধু

নিজের ভাবনা ও অনুভবকে প্রকাশ করে এবং অপরকে সঠিকভাবে জেনে মানবিক জ্ঞাপনের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করছে এবং তৈরি হচ্ছে সামাজিক অসহযোগিতার বাতাবরণ। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের মধ্যে বোঝাপড়া ও সম্পর্ক স্থাপনে মানবিক জ্ঞাপনের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

১.৪ জ্ঞাপনের সংজ্ঞা

জ্ঞাপন বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞাপনকে বোঝবার চেষ্টা করেছেন। যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে অনুধাবন করেছেন জ্ঞাপনের চরিত্রকে। এবার তাঁদের বক্তব্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

কলিন চেরি বলেছেন জ্ঞাপন হল উদ্দীপনা প্রেরণ এবং প্রত্যুত্তর সৃষ্টির প্রক্রিয়া (Communication is transmission of stimuli and the evocation of response)। একজন ব্যক্তি যখন অন্য একজনের কাছে কোন বার্তা পাঠায় তখন ঐ বার্তার অবশ্যই উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। উদ্দীপনা থেকেই প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। আর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে প্রত্যুত্তর। Collin Cheery-র মূল বক্তব্য হল বার্তা বিনিময়ের মতো যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে জ্ঞাপন সীমাবদ্ধ থাকে না। উদ্দীপনা ও প্রত্যুত্তর জ্ঞাপনকে অর্থবহ করে তোলে। বার্তার আদানপ্রদান নতুন মাত্রা যোগ করে।

জর্জ গার্বনার জ্ঞাপনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, জ্ঞাপন হল বার্তা বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে সংঘটিত এক সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া (Communication is social interaction through messages)। জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে যে বার্তা বিনিময় ঘটছে তা সর্বদাই সামাজিক আন্তসম্পর্ককে প্রভাবিত করছে। সমাজে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে প্রতিনিয়ত যে অসংখ্য জ্ঞাপন ঘটছে তা অনিবার্যভাবে তৈরি করছে এক সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া যার মাধ্যমে নিরন্তর মানুষ, প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিকদল, সরকারের মধ্যে আন্তসম্পর্ক গড়ে উঠছে। পরিণামে তৈরি হচ্ছে এক বিশেষ সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত যার মধ্যে নিহিত থাকছে নির্দিষ্ট সামাজিক মূল্যবোধ, বিশ্বাস, নীতি, জীবনবোধ ও সাংস্কৃতিক চেতনা। জ্ঞাপন যত বেশি ঘটবে তত বেশি আন্তসম্পর্কের ক্ষেত্রে তত বিস্তৃত হবে। ফলে সামাজিক মিথষ্ক্রিয়াও তীব্র হয়ে উঠবে।

উইলবার স্রাম বলেছেন, জ্ঞাপন সাধারণগ্রাহ্যতা প্রতিষ্ঠা করে। আমরা যখন কাউকে কিছু জ্ঞাপন করি তখন তার সঙ্গে তথ্য, ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি ভাগ করে নেওয়ার চেষ্ট করি। প্রেরক ও গ্রহীতা একটা বোঝাপড়ায় আসতে চায়। সাধারণগ্রাহ্যতার মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয় এই পারস্পরিক বোঝাপড়া। Schramm-এর কথায় "When we communicate, we are trying to establish a commonness with some one. That is, we are trying to share information, an idea or an attitude."

John C. Merril এবং Ralph L. Lowerstein জ্ঞাপনকে দ্বি-মুখী রাস্তা বলে অভিহিত করেছেন। এঁদের বক্তব্য হল "Communication as a process is a two way street, messages flow bothways... ..." বার্তা বিনিময় যখন ঘটে তখন তা এই দ্বিমুখী রাস্তা ধরে চলে। প্রেরক ও গ্রহীতা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার দুই প্রান্তে। তাঁদের আদান প্রদান দ্বিমুখী এই রাস্তায় ঘটছে।

Bernard Berelson এবং Leonard Berkowitz বলেছেন জ্ঞাপন হল প্রতীকের সাহায্যে তথ্য, আবেগ, ভাবনা ও দক্ষতার প্রেরণ (Communication is the transmission of information, ideas, emotions, skills etc. by use of symbols)। যে কোন বার্তার মধ্যে তথ্য, আবেগানুভূতি, ভাবনা ও দক্ষতা থাকতে পারে। অন্য কোন মানুষের কাছে এগুলিকে পৌঁছে দেবার জন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান জ্ঞাপনের সাহায্য নিতে পারে। জ্ঞাপন-ক্রিয়া এগুলিকে পৌঁছে দেবে প্রতীকের সাহায্যে। এই প্রতীক ভাষা দৃশ্য অথবা সুরে হতে পারে। যে কোন জ্ঞাপনে প্রতীকের উপস্থিতি থাকা দরকার। প্রতীক ছাড়া জ্ঞাপন কোন মতেই সম্ভব নয়। প্রতীকের

গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে Denis C. Alexander জ্ঞাপনকে প্রতীকি আচরণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন জ্ঞাপন হল, প্রতীকি আচরণ যা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন অর্থ ও মূল্যবোধ পৌঁছে দিচ্ছে (Communication is a symbolic behaviour, which results in various degrees of shared meanings and values between participants)। কথায়, সুরে যেভাবেই হোক না কেন, আমরা একটি তথ্য অথবা ভাবাবেগ পৌঁছে দিতে চাই অন্য কারোর কাছে। কথা এখানে প্রতীক এবং কথার দ্যোতনা চায় গ্রহীতাকে প্রভাবিত করতে। দুঃখের কথার দুঃখবোধ, সুখের কথায় আনন্দ পৌঁছে দিতে পারলেই জ্ঞাপন সফল হবে।

১.৫ উপাদান

জ্ঞাপনের প্রয়োজনীয় উপাদান পাঁচটি। এগুলি হল যথাক্রমে (১) প্রেরক, (২) গ্রহীতা, (৩) বার্তা, (৪) মাধ্যম, (৫) প্রতিক্রিয়া। যে কোন জ্ঞাপন-ক্রিয়ার এই পাঁচটি উপাদান থাকবেই। প্রেরক ও গ্রহীতা সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন বার্তা পাঠাবার জন্য। বার্তা পৌঁছায় মাধ্যমের দ্বারা। বার্তা পৌঁছলেই কিন্তু জ্ঞাপন শেষ হয়ে যায় না। যিনি বার্তা গ্রহণ করছেন তাঁর মধ্যে বার্তা কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে সেটাও লক্ষণীয়। ধরা যাক দুই বন্ধু টেলিফোনে কথা বলছে। একজন হল প্রেরক এবং অন্যজন হল গ্রহীতা। কথা হল বার্তা, টেলিফোন হল মাধ্যম। সে বন্ধু শুনছে তার মধ্যে কথা রূপ বার্তা প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে। ঐ প্রতিক্রিয়া মধ্য থেকে তৈরি হচ্ছে নতুন ভাবনা যা বার্তা হিসেবে আবার ফিরে আসছে প্রেরকের কাছে। এই পাঁচটি উপাদানের নিজস্ব মাত্রা রয়েছে। প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে জ্ঞাপনকে প্রভাবিত করে। প্রথমে প্রেরক বার্তা নির্ধারণ করেন। বার্তার রূপ কি হবে তা ঠিক করবেন প্রেরক। বার্তার রূপ নির্ধারণে বিভিন্ন বিষয় বিবেচনার মধ্যে রাখা হয়। যেমন কাকে বলা হচ্ছে। অর্থাৎ গ্রহীতা কে এবং কীভাবে বলা হবে অর্থাৎ কোন মাধ্যমে। এমন কি সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথাও মাথায় রাখতে হয়। মাধ্যমের ভূমিকাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মাধ্যম টেলিফোন হতে পারে। সংবাদপত্র হতে পারে, রেডিও অথবা টেলিভিশনও হতে পারে। মাধ্যম জ্ঞাপন-ক্রিয়াকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে। প্রযুক্তিগত উন্নতি মাধ্যমকে প্রভূত শক্তিশালী করে তুলেছে। গণমাধ্যম হিসেবে টেলিভিশনের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। টেলিভিশন জ্ঞাপনক্রিয়ায় এত প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে যে বার্তা থেকে গ্রহীতা এমনকি প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত এই উন্নত মাধ্যমটির দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। জ্ঞাপনক্রিয়া কতখানি সফল হল তা বোঝা যাবে বার্তার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ক্ষমতা দিয়ে। গ্রহীতা বার্তা গ্রহণ করে কতটা উদ্দীপিত হচ্ছে সেটা বোঝা যাবে প্রতিক্রিয়া দিয়ে। প্রেরক বার্তা পাঠাচ্ছে গ্রহীতার মধ্যে অবশ্যই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার কথা ভেবে। মন্তব্য প্রতিক্রিয়ার কথা অনেক সময় আগে থেকেই ভেবে রাখা হয়।

১.৬ জ্ঞাপনের কাজ

প্রত্যেকটি জ্ঞাপন-ক্রিয়ার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। আর তা রূপায়ণের জন্যই জ্ঞাপনকে কাজ করতে হয়। তথ্য, ভাবনা ও মতামতের আদান-প্রদান সমাজে অনেক কাজ করছে। এই কাজগুলি আলোচনা করলেই জ্ঞাপন-ক্রিয়ার সামগ্রিক কাজের রূপটি পাওয়া যাবে। বর্তমানে আধুনিক সমাজে জ্ঞাপনের কাজের গুরুত্ব অপরিসীম। যতদিন যাচ্ছে কাজের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজগুলি হল যথাক্রমে ঃ

ক) তথ্য সরবরাহ করা ঃ

তথ্য সরবরাহ করা জ্ঞাপনের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। অধিকাংশ জ্ঞাপন-ক্রিয়া এই তথ্য সরবরাহের কাজ

সম্পন্ন করছে। শিক্ষক শিক্ষা দিতে গিয়ে তথ্য দিচ্ছেন ছাত্রকে, সংবাদপত্র তথ্য দিচ্ছে, সরকার ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রচুর তথ্য সরবরাহ করছে। তথ্যের আদান-প্রদান মানুষকে বিবিধ বিষয় সম্পর্কে অবহিত করছে।

খ) শিক্ষা ঃ

জ্ঞাপনের অন্যতম কাজ হল শিক্ষার প্রসারে সাহায্য করা। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বত্রই জ্ঞাপনের মাধ্যমে শিক্ষার কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। শিক্ষক ক্লাসে পড়াচ্ছেন, ছাত্র লাইব্রেরীতে গিয়ে বই পড়ছে সবেতেই রয়েছে জ্ঞাপন। জ্ঞাপনের মাধ্যমে মানুষ আরও শিক্ষিত, পরিণত হয়ে উঠছে। বক্তৃতা, বইপত্র, আলাপ-আলোচনা এবং সাম্প্রতিককালে বৈদ্যুতিন মাধ্যম ও কম্পিউটারের সাহায্যে শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ছে মানুষের মধ্যে। সামাজিক, সংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও বিবিধ বিষয় সম্পর্কে উন্নত চিন্তাভাবনা বয়ে চলেছে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের কাছে। তৈরি হচ্ছে শিক্ষার উত্তরাধিকার।

গ) বিনোদন ঃ

জ্ঞাপনের সবচেয়ে জনপ্রিয় কাজটি হল বিনোদন। প্রতিদিন জ্ঞাপনের মাধ্যমে হরেক রকম বিনোদন পৌঁছে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে। মানবজীবনকে সুন্দর ও সুখী করে তোলার কাজে বিনোদনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কথায়, সুরে, নাটকে মানুষ এই বিনোদন পাচ্ছে। এ সবই হল জ্ঞাপন। বর্তমানে বিনোদনের সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যমে হল সাহিত্য, চলচ্চিত্র, ভিডিও, রেডিও ও টেলিভিশন। উপগ্রহ চ্যানেলের মাধ্যমে চব্বিশ ঘন্টা বিনোদনের প্যাকেজ পৌঁছে যাচ্ছে মানুষের কাছে। গণমাধ্যমের বিপুল জনপ্রিয়তার পিছনে জ্ঞাপনের এই বিনোদন দেবার ক্ষমতাই প্রধান কারণ। গ্রাম জীবনেও লোকসংস্কৃতি কোটি কোটি মানুষের কাছে বিনোদন পৌঁছে দিচ্ছে। লোকগান, লোকনৃত্যের মতো জ্ঞাপনক্রিয়া মানুষের মন জয় করছে।

ঘ) প্রণোদন ঃ

প্রণোদনের কাজটিও করে জ্ঞাপন। মানুষের মতামত ও আচরণে প্রভাবিত করার জন্যই প্রণোদনের প্রয়োজন। বিভিন্ন উন্নয়ণমূলক প্রকল্পকে সফল করার জন্য মানুষকে প্রণোদিত করা দরকার। জ্ঞাপনের মাধ্যমে এই কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। সভা-সমিতি ও আধুনিক গণমাধ্যমের মধ্য দিয়ে প্রণোদনের লক্ষ্যে বিশেষ বার্তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব সাধারণ মানুষের কাছে। আইন মেনে চলা দরকার, পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে সুপরিকল্পিতভাবে প্রচার চালানো হয়। মানুষকে প্রণোদিত করাই এই প্রচারের অন্যতম উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। জনস্বাস্থ্য রক্ষায় ও পরিবার পরিকল্পনাকে সফল করার জন্য আবেদন সমৃদ্ধ জ্ঞাপন-বার্তা সরকারের পক্ষ থেকে প্রায়শই প্রচারিত হয়।

ঙ) সামাজিকীকরণ ঃ

এই প্রক্রিয়া মানুষকে সমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে সাহায্য করে। তথ্যের আদান-প্রদান ও শিক্ষাবিস্তার যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার বাতাবরণ তৈরি করে প্রকৃতপক্ষে তাই সামাজিকীকরণকে বাস্তবায়িত করে। পরিবারে, স্কুল কলেজে, প্রতিনিয়ত মানুষ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে নিজেকে যুক্ত করে, সামাজিক বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে। ধীরে ধীরে সমাজের একজন হয়ে ওঠে। বর্তমানে গণমাধ্যম এই সামাজিকীকরণে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

চ) সুসংহতি ঃ

সমাজের মধ্যে বসবাসকারী বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর মধ্যে তথ্য, চিন্তা-ভাবনা, মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গীর আদানপ্রদানের ফলে সংহতি আসে। জ্ঞাপন মানুষে মানুষে যোগাযোগ ঘটার, জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্মগত

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য নিয়ে আসে। সামাজিক ভেদাভেদ ও সংকীর্ণতা দূর হতে পারে। জ্ঞাপন শুধুমাত্র ব্যক্তির প্রয়োজন মেটায় না, সামাজিক চাহিদাও পূরণ করে।

১.৭ জ্ঞাপনের ইতিহাস

জ্ঞাপনের হাত ধরেই মানব সভ্যতার বিকাশের সূচনা হয়েছে। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিই অনুপ্রাণিত করেছে মানুষকে নিজেকে প্রকাশ করতে। প্রথমে মানুষের মুখে ভাষা ছিল না। কিন্তু নিজেকে প্রকাশ করার তাগিদে একদিন তার মুখে উঠে এল ভাষা। নিজের অনুভব, চাহিদা ও প্রয়োজনকে শব্দ প্রতীকের মাধ্যমে মানুষ প্রকাশ করতে শিখল। উইল ডুরান্ট বলেছেন মানব সভ্যতার শুরু হল যেদিন, সেদিন প্রথম মানুষের মুখে উচ্চারিত হয়েছিল কয়েকটি বিশেষ্য পদ। আগুন, ঝড়, পাহাড়, সমুদ্র, বৃষ্টি শব্দ প্রকাশ করল বাস্তব পরিস্থিতি ও অবস্থাকে।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিজের প্রয়োজনকে আলাদা করে চিনতে পারল এবং প্রয়োজনমতো তা প্রকাশ করতে শিখল। মুখের ভাষা, গান, ড্রাম, অগ্নিসংকেত, শারীরিক মুদ্রা প্রভৃতির দ্বারা একের সঙ্গে অপরের, একের সঙ্গে বহুর সম্পর্ক তৈরি হতে শুরু হল।

প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হল ভাষা। এই ভাষা হল কতকগুলি প্রতীকের সমষ্টি। প্রথমে ভাষা বলতে ছিল শুধু মুখের ভাষা। বুদ্ধি দিয়ে এবং সহজাত অনুকরণ ক্ষমতা দিয়ে মানুষ নতুন নতুন শব্দ উদ্ভাবন করেছে। শব্দের অর্থ যাতে সকলের কাছে সমানভাবে অর্থবহ হয়ে ওঠে তার চেষ্টা করেছে। যেমন মানুষ বলতে সকল মানুষ, বাড়ি বলতে সকল আবাসস্থল বোঝা যায়। একটি শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতীকি অর্থ সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিছুদিনের মধ্যেই মুখের ভাষার সীমাবদ্ধতা বোঝা যায়। মুখের কথায় কেবলমাত্র দু'দশজনকেই মনের ভাব বোঝানো যায়। বহু মানুষের দরবারে বার্তা পৌঁছে দেওয়া যায় না। তাই লিখিত ভাষায় অন্বেষণ শুরু হয়। আবিষ্কার হয় চিত্রের মধ্য দিয়ে ধ্বনির বিকল্প প্রতীকগুচ্ছ। ধীরে ধীরে তা রূপ নেয় বর্ণমালায়। বর্ণমালাকে আশ্রয় করে এর পর জন্ম নেয় লিখিত ভাষা। হাজার হাজার বছরের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজ যে ভাষা ব্যবহার করি তা গড়ে উঠেছে।

De Vito ভাষার তিনটি কার্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল ঃ (১) ভাষা জ্ঞাপনের প্রাথমিক বাহন হিসবে কাজ করে, (২) ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে প্রতিফলিত করে এবং তাঁর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের প্রকাশ ঘটায়। এর ফলে ব্যক্তিত্ব ও সংস্কৃতি উভয়ই বিকশিত হয়, (৩) সমাজ সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখে এবং সামাজিক গোষ্ঠীর কার্য ও নিয়ন্ত্রণকে সুগঠিত করে। ভাষার উপযোগিতা বোঝাতে এই কাজগুলি যথেষ্ট। যতদিন গেছে ভাষা আরও উন্নত হয়েছে এবং তা জ্ঞাপনকে করেছে সুসংহত ও সুগঠিত।

যন্ত্রের ব্যবহার জ্ঞাপনের ইতিহাসে বৈপ্লবিক রূপান্তর নিয়ে এসেছিল। এর আগে নবম শতাব্দীতে চীনে কাগজের আবিষ্কার ঘটেছিল। যন্ত্রের সাহায্যে যে কোন বিষয়কে বহু মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কার জ্ঞাপন ব্যবস্থায় নিয়ে এসেছিল এক বিরাট পরিবর্তন। ১৪৫৬ সালে জার্মানিতে গুটেনবার্গ আবিষ্কার করেন মুভেবল টাইপ ও মুদ্রণযন্ত্র। প্রথম বই ছাপা হয় বাইবেল। দ্রুত ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে মুদ্রণযন্ত্রের ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে। ছাপা হতে থাকে বই ও প্যামফ্লেট। মুদ্রণযন্ত্র সংবাদপত্রের প্রকাশনাকেও সম্ভব করে তোলে। ১৬২২ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় উইকলি নিউজ। ১৬৯০ সালে বোস্টন থেকে প্রকাশিত হয় পাবলিক অকারেন্স। সংবাদপত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে গণমাধ্যমের রূপরেখা তৈরি হয়ে যায়।

১৮৩৫ সালে Samuel Morse আবিষ্কার করেন টেলিগ্রাফ। তারের মাধ্যমে দূরপ্রান্তরের সঙ্গে সংযোগরক্ষায় টেলিগ্রাফ হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ মাধ্যম। তথ্য সরবরাহে ও যোগাযোগ রক্ষায় টেলিগ্রাফ যুগান্তকারী

ভূমিকা পালন করে। ১৮৭৬ সালে Graham Bell-এর টেলিফোল আবিষ্কারের পর জ্ঞাপনে আরও বেশি গতি যুক্ত হল। মুহূর্তের মধ্যে এক প্রান্তের সঙ্গে অন্য প্রান্তের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হল। প্রেরক ও গ্রাহক একই সঙ্গে জ্ঞাপনক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছে। টেলিফোনে প্রেরক সরাসরি বার্তা পৌছে দিতে পারে গ্রহীতার কাছে। টেলিফোন আবিষ্কারের পর থেকেই জ্ঞাপন ব্যবস্থায় দ্রুত উন্নতি ঘটতে থাকে। কয়েক বছরের মধ্যে Edison -এর ফোনোগ্রাফ জ্ঞাপন ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করে। ১৮৯৫ সালে লুমিয়ের ব্রাদার্স ফ্রান্সে প্রথম সিনেমা প্রদর্শন করেন। সিনেমা পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

১৯০১ সালে বেতার সম্প্রচার মার্কিন বিজ্ঞানী মার্কিন প্রথম করে দেখালেও, বেতার আবিষ্কারের পিছনে বহু বিজ্ঞানীর অবদান রয়েছে। মাইকেল ফ্যারাডে, হাইনারিখ হারৎজ তার পূর্বে বেতার তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণ করে দেখান। প্রথম বেতার সম্প্রচার হয় ১৯২০ সালের ২ নভেম্বর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পিটস্‌বার্গ শহরে। ১৯২২ সালে ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কোম্পানি বেতার সম্প্রচার শুরু করে। ভারতে প্রথম বেতার সম্প্রচার হয় ১৯২১ সালে বোম্বাই শহরে।

টেলিভিশন সম্প্রচারের আবিষ্কারের পিছনেও বিজ্ঞানীদের যৌথ প্রচেষ্ট রয়েছে। জার্মানি বিজ্ঞানী Paul Gottileb Nipkon ১৮৬৪ সালে প্রথম এক জায়গার ছবি অন্য জায়গার পাঠাবার চেষ্টা করেন। ১৯২২ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী Philo T. Fransworth electronic Scanning আবিষ্কার করেন। ১৯২৬ সালে J. L. Baird রয়াল ইনস্টিটিউটে টেলিভিশনের ছবি সম্প্রচার পরীক্ষাসহ উপস্থিত করেন। ১৯২৮ সালে বিবিসি প্রথম স্থির চিত্র পরীক্ষামূলকভাবে পাঠানো শুরু করেন। ১৯৩৬ সালে বিবিসি আলেকজান্দ্রা প্রাসাদ থেকে প্রথম সাধারণ মানুষের জন্য টেলিভিশনের সম্প্রচার শুরু করে। পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে ইউরোপ ও আমেরিকার টেলিভিশন সমাজ জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে। ভারতে প্রথম টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু হয় ১৯৫৯ সালে দিল্লিতে।

কম্পিউটার প্রযুক্তি জ্ঞাপন ব্যবস্থার চরিত্র আমূল বদলে দিয়েছে। মুদ্রণ থেকে উপগ্রহ চ্যানেল সমস্ত গণমাধ্যমই আজ কম্পিউটার প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল। ইন্টারনেট ব্যবস্থা যোগাযোগ ব্যবস্থায় নিয়ে এসেছে বৈপ্লবিক রূপান্তর। সমগ্র বিশ্বই ঘনিষ্টসূত্রে আবদ্ধ হয়েছে। পৃথিবী আজ বিশ্ব গ্রামে (global village) পরিণত হয়েছে। গণমাধ্যম এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে সাংস্কৃতিক রূপরেখাই গেছে পাল্টে। সামাজিক যোগাযোগের ওপর মানুষ আর এখন নির্ভর করে না। ঘরে বসে টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমেই সারা বিশ্বের সঙ্গে সে যোগাযোগ বজায় রাখছে। সমাজতাত্ত্বিকেরা একে বলছেন গণসংস্কৃতি (mass culture)।

সারসংক্ষেপ ঃ মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ তৈরি হয় জ্ঞাপনের মাধ্যমে। মানুষ নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। কথায়, সুরে, ছবিতে, দেহের ভঙ্গীমায় ও লেখায়। মনের ভাব, প্রতিক্রিয়া প্রকাশের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই মানুষকে জ্ঞাপনে উৎসাহিত করেছে। লাতিন শব্দ communis থেকে ইংরেজি communication। জ্ঞাপন সর্বদা চেষ্টা করে একটা সাধারণগ্রাহ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে। একজন আরেক জনের কথা বুঝতে পারে, অনুভব করতে পারে। সাধারণগ্রাহ্যতা আছে বলেই তা সম্ভব। সংস্কৃত সাহিত্যেও সাধারণীকরণের কথা আছে। রবীন্দ্রনাথ থেকে রবিশংকর সকলেই জ্ঞাপনকার্যে প্রেরক ও গ্রহীতার সমান অংশগ্রহণের কথা বলেছেন।

সংজ্ঞা ঃ বিভিন্ন জ্ঞাপনবিদরা জ্ঞাপনের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে Colin, Cherry, George Gerbuer, Wilbur, Schramm, Ralph L. Lowerstein উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সংজ্ঞা থেকে মূল যে বক্তব্য বেরিয়ে আসে তা হল জ্ঞাপন একটি বিরামবিহীন প্রক্রিয়া যা দুই বা ততোধিক মানুষের মধ্যে প্রতীকের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করে।

উপাদান ঃ জ্ঞাপনের উপাদান পাঁচটি — (১) প্রেরক, (২) গ্রহীতা, (৩) বার্তা, (৪) মাধ্যম, (৫) প্রতিক্রিয়া। যে কোন জ্ঞাপনে অতি অবশ্যই এই পাঁচটি উপাদান থাকবে। প্রত্যেকটি উপাদানের নিজস্ব মাত্রা রয়েছে, যা জ্ঞাপনকে সার্থক করে তোলে।

জ্ঞাপনের কাজ ঃ জ্ঞাপনক্রিয়া যে সমস্ত কাজ করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তথ্যসরবরাহ, শিক্ষা, বিনোদন, প্রণোদন, সামাজিকীকরণ, সুসংহতি ইত্যাদি।

জ্ঞাপনের ইতিহাস ঃ জ্ঞাপনের উদ্ভব হয়েছে সভ্যতার একেবারে উষাকালে। প্রথমে মানুষ দেহের ভঙ্গীমায় নিজেকে প্রকাশ করত। পরে তার মুখে এল ভাষা। এরপর লিখিত ভাষার উদ্ভব হয়। কাগজের আবিষ্কার ও মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার জ্ঞাপন ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতি নিয়ে আসে। উদ্ভব হয় সংবাদপত্রের। এরপর আবিষ্কৃত হয় টেলিগ্রাফ। যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত দ্রুত হয়ে ওঠে। টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন এবং সিনেমা আবিষ্কারের ফলে আধুনিক গণমাধ্যম জ্ঞাপন ব্যবস্থার চরিত্র আমূল পাল্টে দেয়। কম্পিউটার, ইন্টারনেট ব্যবস্থা বিশ্বের নানা প্রান্তকে এক সূত্রে গেঁথে ফেলেছে। বাস্তবায়িত হয়েছে বিশ্বপল্লীর global village-এর ধারণা।

১.৮ জ্ঞাপনের বিভিন্ন রূপ

জ্ঞাপনের প্রকৃতি ও চরিত্র অনুযায়ী জ্ঞাপনের বিভিন্ন রূপ পাওয়া যায়। প্রাথমিকভাবে জ্ঞাপন দু'রকম হতে পারে — ১) মৌখিক (verbal), ২) অ-মৌখিক (non-verbal)।

মৌখিক জ্ঞাপন (verbal communication) ঃ কথার মাধ্যমে যে জ্ঞাপন হয় তাকেই বলা হয় মৌখিক জ্ঞাপন। দুই বন্ধু কথা বলছে, নেতা ভাষণ দিচ্ছেন, শিক্ষক ক্লাসে পড়াচ্ছেন, এ সবই হল মৌখিক জ্ঞাপন। মুখের ভাষাই এই জ্ঞাপনে বার্তা এবং গানও মৌখিক জ্ঞাপনের মধ্যে পড়ে। প্রেরক ধ্বনির প্রয়োগ ঘটান তিনি কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে চান সেটা ভেবে নিয়ে। আনন্দের কথা, খুশীর কথা তিনি যেভাবে বলেন, দুঃখের, বিষাদের কথা সেভাবে বলেন না। টেলিফোনে, বেতারে ও টেলিভিশনেও মৌখিক জ্ঞাপনের প্রয়োগ হতে পারে। তবে প্রযুক্তির ব্যবহার এই জ্ঞাপনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। প্রেরক তাঁর বার্তা এই অনির্দিষ্ট শ্রোতৃমন্ডলী অথবা দর্শকমন্ডলীর কাছে পৌঁছে দেন। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় না।

অ-মৌখিক (non-verbal) ঃ কথা ছাড়াও জ্ঞাপন হয়। দেহের ভঙ্গীমায়, লেখায় ছবিতে যে প্রকাশ তা অ-মৌখিক জ্ঞাপন। নৃত্যে, চিত্রকলায় যে শিল্পরূপ ফুটিয়ে তোলা হয় তার উদ্দেশ্য হল মানুষের মন জয় করা। মানুষের মনকে নাড়া দেবার জন্যই তৈরি হয় নৃত্যের ছন্দ, চিত্রকলার রং রেখার কারুকার্য। দর্শক নৃত্য দেখে, ছবি দেখে শিল্পরসের সন্ধান পায়। এটা সম্ভব হচ্ছে অ-মৌখিক জ্ঞাপনের মাধ্যমে। লেখায় ক্ষেত্রেও এটা সমানভাবে প্রযোজ্য। বই, সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র প্রভৃতি মুদ্রণ মাধ্যমেও যে জ্ঞাপন হচ্ছে তা হল অ-মৌখিক জ্ঞাপন। বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞাপন হচ্ছে, যেমন ই-মেল, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জ্ঞাপন ইত্যাদি। এগুলিও অ-মৌখিক জ্ঞাপন।

১.৯ পারস্পরিক জ্ঞাপন

দুই ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক যে জ্ঞাপনক্রিয়া সংঘটিত হয় তাকে বলে পারস্পরিক জ্ঞাপন বা interpersonal communication। কথাবার্তার আদান-প্রদানে, অভিব্যক্তির প্রকাশে, দেহভঙ্গীমার মধ্য দিয়ে পারস্পরিক জ্ঞাপন বলে। প্রধানত কথাই হল এই জ্ঞাপনের মাধ্যম। মানুষ কথার মাধ্যমে ভাবনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করে। এক

বিশেষ সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের মধ্যে এই জ্ঞাপন ঘটে। অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলে মানুষ যে শুধু তথ্য বিনিময় করছে তা নয়, কথা বলে একে অন্যকে আবেগের দ্বারা প্রভাবিত করছে, হৃদয় জয় করছে, দুঃখে সুখে একে অপরকে সমান অংশীদার করে তুলছে। পারস্পরিক জ্ঞাপনে শুধুমাত্র কার্যকরী উপযোগীতা নেই, আনন্দ ও অনুভবও আছে। পারস্পরিক বোঝাপড়া তৈরির অবকাশ আছে। এই জ্ঞাপনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তাৎক্ষণিক প্রতিবার্তা (immediate feedback) পাওয়া সম্ভব। কাউকে কোন কথা বলা মাত্রই ঐ কথা তার মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে তা জানা সম্ভব। টেলিফোনে, কম্পিউটার নির্ভর ইন্টারনেটেও পারস্পরিক জ্ঞাপন ঘটতে পারে।

১.১০ অর্ন্তমুখী জ্ঞাপন

মানুষের নিজের মনের মধ্যেও জ্ঞাপন ক্রিয়া চলে। চিন্তা ও ভাবনার বুনোটের মধ্যেই বার্তার আদান-প্রদান চলে। ভাবতে ভাবতেই নতুন উপলব্ধিতে পৌঁছে যায় মানুষ। অন্তরের মধ্যে ক্রিয়াশীল এই জ্ঞাপনে প্রধান আধারই হল চেতনা। আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনা, সৃজনশীল চিন্তা এগিয়ে চলে এই অন্তর্মুখী জ্ঞাপনকে আশ্রয় করে। মানুষ নিজে মনে মনেই বার্তা ঠিক করে তা পৌঁছে দেয় নিজের কাছে। যাচাই করে তার সঠিকতা, তারপর ঐ বার্তা থেকে পৌঁছায় নতুন উপলব্ধিতে। ব্যাপারটি পুরোপুরি মনস্তাত্বিক।

১.১১ দলগত জ্ঞাপন

বেশ কিছু মানুষ যখন জ্ঞাপনক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তখন যে জ্ঞাপন ঘটে তখন তাকে বলে দলগত জ্ঞাপন। এ ক্ষেত্রেও কথাই হল প্রধান মাধ্যম। অভিব্যক্তি ও দেহভঙ্গীমা এই কথার আদান-প্রদানকে আরও অর্থবহ করে তোলে। সভা-সমিতি, আলোচনা, সভা, আড্ডা হল দলগত জ্ঞাপনের ভাল উদাহরণ। এক সঙ্গে সবাই কথা বলতে পারে না। একজন বলে সবাই শোনে। তারপর একে একে সবাই বলার সুযোগ পায়। পারস্পরিক জ্ঞাপনের মতো তাৎক্ষণিক প্রতিবার্তা সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় না। একটু দেরিতে প্রতিবার্তা জানা যায়। দল যত বড় হয়, প্রতিবার্তা পেতে তত দেরি হয়। বহু মানুষের মধ্যে ভাব বিনিময় সম্ভব হয়। এই দলগত জ্ঞাপনে বহু মানুষের মধ্যে বোঝাপড়া তৈরি করতে এই জ্ঞাপন খুবই কার্যকরী।

১.১২ গণজ্ঞাপন

জ্ঞাপন যখন বহু মানুষের উদ্দেশ্যে করা হয় তখনই ঘটে গণজ্ঞাপন। এক কথায় বলা যেতে পারে গণ-র উদ্দেশ্যে করা জ্ঞাপনই হল গণজ্ঞাপন। এই জ্ঞাপনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল যন্ত্রনির্ভরতা। যান্ত্রিক উপায়ে বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয় অনির্দিষ্ট বিপুল জনসমষ্টির কাছে। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, ভিডিও, সিনেমা হল গণজ্ঞাপনের মাধ্যম। প্রতিটি মাধ্যমই হল যন্ত্রনির্ভর।

গণজ্ঞাপন প্রেরক ও গ্রহীতার মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাতে পারস্পরিক জ্ঞাপনের মতো তাৎক্ষণিক ও স্বতস্ফুর্ততা একেবারেই থাকে না। প্রতিবার্তাও তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় না। আজকাল টেলিফোনে দর্শকের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করার একটা চেষ্টা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই ব্যবস্থাও খুশীমতো সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ সবসময় বজায় রাখতে পারে না। টেলিফোনে লাইন পাওয়া খুবই শক্ত।

গণজ্ঞাপন পুরোপুরি পরিকল্পিত জ্ঞাপন-ক্রিয়া। যথেষ্ট ভাবনাচিন্তা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত বার্তাকে পাঠক অথবা দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। বার্তার পরিকল্পিত রূপ দর্শকের মনে গভীর প্রভাব ফেলে। মনকে অনেক গভীরভাবে নাড়া দিয়ে যায়। আধুনিক সমাজে তাই গণজ্ঞাপণের প্রভাব অনেক বেশি।

১.১৩ চিরায়ত জ্ঞাপন

বহুদিন ধরে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করছে এই চিরায়ত জ্ঞাপনের মাধ্যমে। যবে থেকে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপনকে অনুমান করার চেষ্টা করেছে তবে থেকেই চল হয়েছে এই চিরায়ত জ্ঞাপনের (traditional communication)। মূলত পারস্পরিক (interpersonal) এবং দলগত জ্ঞাপন (group communication)-এর মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে চিরায়ত জ্ঞাপন। লোকগান, লোককথা, যাত্রা, লোকনৃত্যের সমন্বয়ে তৈরি হয় চিরায়ত জ্ঞাপনের ঐতিহ্য। লোকায়ত জীবনদর্শন এবং সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয় এই চিরায়ত জ্ঞাপনের মধ্যে। ভারতের গ্রামাঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে এই চিরায়ত জ্ঞাপন চলে আসছে। আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতি পরিপুষ্ট হয়েছে মূলত দলগত জ্ঞাপন ভিত্তিক চিরায়ত জ্ঞাপনের দ্বারা। পুরুলিয়ার ছৌ-নাচ, বীরভূমের বাউলগান, উড়িষ্যার সম্বলপুরী নৃত্য, গুজরাটের গারবা নৃত্য, মধ্যপ্রদেশের ছত্তিশগড়ী লোকনৃত্য চিরায়ত জ্ঞাপনের উজ্জ্বল উদাহরণ। এই জ্ঞাপন প্রধানত দু'উপায়ে সম্পন্ন হয়—(১) মৌখিক (verbal), (২) দৃশ্য (visual)।

মৌখিক (verbal) ঃ মুখের কথাকে আশ্রয় করেই চিরায়ত জ্ঞাপনের এক বিশাল অংশ বাস্তবায়িত হয়। ছড়া, গান, নাটক, যাত্রা সবই অনুষ্ঠিত হয় মুখের কথায়। লোকশিল্পীরা কথার মাধ্যমেই শিল্পরূপ পৌঁছে দেন মানুষের কাছে। বাংলার বাউলগান, ভাটিয়ালি, উত্তরপ্রদেশ, বিহারের রামলীলা সম্পূর্ণভাবে কথাভিত্তিক জ্ঞাপন। গানে, নাটকে কথাই হল জ্ঞাপনের মাধ্যমে।

দৃশ্য (visual) ঃ চিত্রের মধ্য দিয়েও চিরায়ত জ্ঞাপন ঘটে। পটচিত্র, দেওয়ালচিত্র, কাপড়ের ওপর চিত্ররূপ এবং বিভিন্ন রকমের হস্তশিল্প সবই দৃশ্যরূপ রচনা করে শিল্পরস মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। কাঁথা শিল্প যে অপূর্ব দৃশ্যরূপ রচনা করে, তার তুলনা নেই। মধুবনী চিত্রকলা দৃশ্য হস্তশিল্পের এক অনন্য উদাহরণ রচনা করে তাঁর তুলনা নেই। ভারতবর্ষে বিভিন্ন অঞ্চলে গৃহনির্মাণের রূপও নানানরকম। কোথাও আটচালা, আবার কোথাও চারচালা বা দু'চালা। চিরায়ত জ্ঞাপনে দৃশ্যের মাধ্যমে যে জ্ঞাপন ঘটে তার আবেদন বিপুল।

১.১৪ সারাংশ

জ্ঞাপন মৌখিক ও অ-মৌখিক দু'রকমমের হতে পারে। শিক্ষক ক্লাসে যখন পড়ান তখন তা হয় মৌখিক জ্ঞাপন। সংবাদপত্র, চিত্রকলা, ইন্টারনেট প্রভৃতি হল প্রধানত অ-মৌখিক জ্ঞাপন।

পারস্পরিক জ্ঞাপন হল জ্ঞাপনের একটি রূপ। পারস্পরিক জ্ঞাপন ঘটে দু'জনের মধ্যে। একজন হয় প্রেরক ও আরেকজন হয় গ্রহীতা। প্রধানত কথার মাধ্যমে বার্তার আদানপ্রদান ঘটে। প্রতিবার্তা সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়। দুই বন্ধু যখন কথা বলে, ভাব বিনিময় করে তখন তা হল পারস্পরিক জ্ঞাপন।

বেশ কয়েকজন মানুষের মধ্যে যখন বার্তার আদানপ্রদান মুখের কথার মাধ্যমে ঘটে তখন তা হল দলগত জ্ঞাপন। আলোচনা সভা, আড্ডা হল দলগত জ্ঞাপনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মানুষের নিজের মনের মধ্যেও জ্ঞাপন-ক্রিয়া চলে। চিন্তার মধ্যেই মানুষ নিজের সঙ্গে কথা বলে। বোঝাপড়ায় আসতে চায়। অনেক সময় আধ্যাত্মিক স্তরে পৌঁছাতে চায়। একে বলে অন্তর্মুখী জ্ঞাপন।

চিরায়ত জ্ঞাপনের মধ্যে মৌখিক এবং দৃশ্য, দুধরনের জ্ঞাপনই হতে পারে। লোকায়ত গান, ছড়া, যাত্রা হল চিরায়ত মৌখিক জ্ঞাপন। দৃশ্য জ্ঞাপনের মধ্যে পড়ে পটচিত্র, কাঁথা শিল্প ও হস্তশিল্পের নিদর্শন।

১.১৫ অনুশীলনী

১) জ্ঞাপন কাকে বলে?

২) জ্ঞাপনের ধারণা সম্পর্কে যা জান লিখুন।

৩) জ্ঞাপনের কাজ কী? সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৪) জ্ঞাপনের ইতিহাস সংক্ষেপে লিখুন।

৫) কত ধরনের জ্ঞাপন দেখা যায়? আলোচনা করুন।

৬) পারস্পরিক জ্ঞাপন ও দলগত জ্ঞাপনের মধ্যে পার্থক্য কী?

৭) গণজ্ঞাপন কাকে বলে? গণজ্ঞাপনের কাজ কী?

৮) গণমাধ্যম কী? গণমাধ্যমের উদ্দেশ্যগুলি বর্ণনা করুন।

৯) মৌখিক ও অ-মৌখিক জ্ঞাপনের মধ্যে পার্থক্য কী?

১০) চিরায়ত জ্ঞাপন কাকে বলে? আলোচনা করুন।

১.১৬ গ্রন্থপঞ্জী

গণজ্ঞাপন ঃ ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়

জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম ঃ ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

Mass Communication Theory and Practice : Uma Narula

Mass Communication and Journalism in India : Keval J. Kumar

একক ২ □ জ্ঞাপন মডেল

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ প্রস্তাবনা

২.৩ প্রতিবার্তা

২.৪ জ্ঞাপন মডেল

২.৪.১ লাসওয়েল মডেল

২.৪.২ শ্যানন উইভার মডেল

২.৪.৩ গার্বনার মডেল

২.৪.৪ নিউকম্ব মডেল

২.৪.৫ ডান্স মডেল

২.৪.৬ ওয়েলসলি এবং ম্যাকলিন মডেল

২.৪.৭ অসগুড মডেল

২.৫ জ্ঞাপন ও সামাজিকীকরণ

২.৬ সারাংশ

২.৭ অনুশীলনী

২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককের বিষয়গুলি জ্ঞাপনকে আরও বিশদভাবে জানতে সাহায্য করবে। সামাজিক প্রেক্ষাপটে জ্ঞাপনের কার্যধারা কেমন ও তার প্রভাব কী সেটা বোঝা যাবে। প্রতিবার্তা থেকে সামাজিকীকরণ পর্যন্ত একক ২-এর পরিধি। যে বিষয়গুলি আলোচিত হবে সেগুলি হল ঃ

- প্রতিবার্তা
- জ্ঞাপন মডেল
- জ্ঞাপন ও সামাজিকীকরণ

২.২ প্রস্তাবনা

যে কোন জ্ঞাপন-ক্রিয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য হল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা। যাকে কিছু বলা হচ্ছে তার মধ্যে প্রতিক্রিয়া তৈরি করাই হল ঐ বলার অন্যতম লক্ষ্য। যদি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তাহলে জ্ঞাপন বাস্তবায়িত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। কী প্রতিক্রিয়া হল সেটা জানাও জরুরী। প্রতিবার্তার মধ্যেই পাওয়া যাবে প্রতিক্রিয়াকে। প্রতিবার্তা সম্পর্কে আলোচনা করলেই জানা যাবে প্রতিবার্তা কী। জ্ঞাপন মডেল জ্ঞাপন ক্রিয়াকে যথাযথভাবে বুঝতে সাহায্য করে। তাত্ত্বিকরা বিভিন্ন মডেলের অবতারণা করেছেন। বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মডেল এখানে আলোচনা করা হয়েছে। সমাজের সঙ্গে জ্ঞাপনের যোগ গভীর। জ্ঞাপন ও সমাজের সম্পর্ক কেমন তা জানা যাবে একেবারে শেষে জ্ঞাপন ও সামাজিকীকরণ শীর্ষক আলোচনায়।

২.৩ প্রতিবার্তা

যে কোন জ্ঞাপনে প্রতিবার্তা (feedback) খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জ্ঞাপনের এক প্রান্তে থাকে প্রেরক এবং অন্য প্রান্তে থাকে গ্রহীতা। প্রেরক বার্তা পৌঁছে দেন গ্রহীতার কাছে। বার্তা পৌঁছে গেলেই কিন্তু জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হয় না। বার্তা গ্রহণ করার পর গ্রহীতার কী প্রতিক্রিয়া হল সেটা জানাও জরুরী। এই প্রতিক্রিয়া প্রেরকের কাছে ফিরে আসে প্রতিবার্তা হয়ে। কোন বার্তা গ্রহীতাকে কতখানি প্রভাবিত করল তা প্রতিবার্তা বিশ্লেষণ করলেই জানা যাবে। জ্ঞাপনকে সার্থক করতে হলে গ্রহীতা কীভাবে বার্তা গ্রহণ করছে সেটা প্রেরকের জানা দরকার। কারণ প্রেরক সবসময়ই চান বার্তা পাঠিয়ে প্রভাবিত করতে। গ্রহীতা যদি প্রভাবিত হন তাহলেই প্রেরক সফল। ক্লাসে যখন শিক্ষক পড়ান তখন তিনি ছাত্রদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেন। ছাত্রদের অভিব্যক্তি দেখেই শিক্ষক বুঝে যান তাঁর বক্তব্য ছাত্ররা কীভাবে গ্রহণ করছে। ছাত্রদের প্রশ্ন থেকেও তিনি কিছুটা আন্দাজ পান। একজন ব্যক্তি যখন অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলেন তখন প্রথম জন দ্বিতীয়জনের কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার প্রতি নজর রাখেন। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই অভিব্যক্তি দেখে তিনি বুঝে যান প্রতিবার্তার চরিত্র। জ্ঞাপনে অংশগ্রহণকারীরা কীভাবে অংশ নিচ্ছেন জ্ঞাপন-ক্রিয়ায় তা বোঝার জন্য প্রতিবার্তার গুরুত্ব রয়েছে।

পারস্পরিক জ্ঞাপনে, দলগত জ্ঞাপনে প্রতিবার্তা খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়। কিন্তু গণজ্ঞাপনে প্রতিবার্তা পেতে দেরি হয়। সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনে প্রেরক সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারেন না বার্তা কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে। প্রতিবার্তা সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় না। অল্প কিছুদিন পরে প্রতিবার্তা পাওয়া সম্ভব। সংবাদপত্রের রিপোর্টারের কাজ পাঠকদের কেমন লাগছে তা তাৎক্ষণাৎ না জানা গেলেও, কিছুদিন পর চিঠিপত্রের মাধ্যমে জানা যেতে পারে। রেডিও, টেলিভিশনেও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবার্তা জানা যায় না। কিছুদিন পরে, চিঠিপত্রের মাধ্যমে অথবা শ্রোতৃমন্ডলীর ওপর সমীক্ষা চালিয়ে জানা সম্ভব।

প্রতিবার্তা সদর্থক ও নঞর্থক, দুরকমেই হতে পারে। সদর্থক প্রতিবার্তা জ্ঞাপন আচরণকে দ্রুত প্রভাবিত করে এবং প্রেরককে উৎসাহিত করে বার্তাকে আরও উন্নত ও সুসংহতভাবে প্রকাশ করার জন্য। নঞর্থক প্রতিবার্তা প্রেরকের কাছে গ্রহীতার কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তা পৌঁছে দেয়। প্রেরক যা বলছেন, গ্রহীতার তা ভাল লাগছে না এটা যে মুহূর্তে তিনি বুঝতে পারবেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেকে সংশোধন করবেন, বার্তা এবং প্রকাশভঙ্গী বদলে ফেলবেন। জ্ঞাপনকে সফল করতে নঞর্থক প্রতিবার্তারও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

বর্তমানে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিবার্তা জানার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করে। কারণ প্রতিবার্তা থেকেই জানা যায় রেডিও টেলিভিশনের অনুষ্ঠান কেমন লাগছে শ্রোতা ও দর্শকদের। অর্ডিয়েন্স রিসার্চের মাধ্যমে এই

প্রতিবার্তা জানা যায়। প্রতিবার্তা জানার পর প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের অনুষ্ঠানের রদবদল করে শ্রোতাদর্শকদের মন মতো করে তোলার চেষ্টা করে। বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও প্রতিবার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। বাজার সমীক্ষার মাধ্যমে এই প্রতিবার্তা সংগ্রহ করা হয়।

যত দিন যাচ্ছে প্রতিবার্তার গুরুত্ব বেশি করে অনুধাবন করা হচ্ছে গণজ্ঞাপণে। সংবাদপত্র থেকে স্যাটেলাইট চ্যানেল সমস্ত গণমাধ্যমই চাইছে সঠিক প্রতিবার্তাটি পেতে। গণমাধ্যমগুলি আজ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে বাজার দখল করার লড়াইতে ব্যস্ত। বেশি পাঠক, বেশি দর্শক পেতে হলে আগে জানতে হবে তারা কীভাবে গণমাধ্যমের পরিবেশিত বিষয়বস্তু গ্রহণ করছে। একমাত্র প্রতিবার্তা বিশ্লেষণ করেই তা জানা সম্ভব। সংবাদপত্র যদি দেখে বিশেষ ধরনের ফিচার পাঠকরা পছন্দ করছে, তাহলে ঐ ধরনের লেখা বেশি ছাপার ব্যাপারে উদ্যোগ নেবে। টেলিভিশনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। চ্যানেলগুলি সমীক্ষা চালিয়ে বোঝায় চেষ্টা করে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া কী। যদি দেখা যায় কোন অনুষ্ঠান দর্শকদের ভালো লাগছে না, তাহলে খুব তাড়াতাড়ি ঐ অনুষ্ঠান বাদ দিতে হবে। আবার যদি দেখা যায় কোন অনুষ্ঠান দর্শকদের ভালো লাগছে তাহলে ঐ ধরনের অনুষ্ঠান প্রযোজনার ব্যবস্থা করতে হবে। এক কথায় বলা যেতে পারে পাঠকদের, দর্শকদের প্রতিবার্তার মধ্যেই নিহিত আছে গণমাধ্যমের সাফল্যের চাবিকাঠি।

২.৪ জ্ঞাপন মডেল

জ্ঞাপন প্রক্রিয়াকে ভালভাবে বোঝায় জন্য জ্ঞাপন বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন মডেলের অবতারণা করেছেন। সমাজে নিরন্তর যে বিভিন্ন ধরণের জ্ঞাপন-ক্রিয়া ঘটছে তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে বিবিধ বিষয়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়গুলিও পরিবর্তিত হচ্ছে। বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন জ্ঞাপন ব্যবস্থার চরিত্র দ্রুত বদলে দিচ্ছে। ঠিক একইভাবে সামাজিক পরিস্থিতিও পরিবর্তিত হচ্ছে জ্ঞাপনের প্রভাবে। এই পারস্পরিক পরিবর্তনের ঘাতপ্রতিঘাতে জ্ঞাপন পদ্ধতিও বদলে যাচ্ছে। মডেল জ্ঞাপন-ক্রিয়াকে যথাযথভাবে বর্ণনা করে, সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিষয়কে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে। বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে জ্ঞাপনক্রিয়া বাস্তবায়িত হয়। মডেল প্রতিটি স্তরকে ব্যাখ্যা করে জ্ঞাপনের সঙ্গে যুক্ত বিষয়গুলিকে বুঝিয়ে দেয়। মডেলকে প্রধানত রেখাচিত্রের মাধ্যমে উপস্থিত করা হয়।

Devito বলেছেন জ্ঞাপন মডেল জ্ঞাপন-ক্রিয়ার পদ্ধতি ও উপাদানগুলিকে সুসংগঠিত করে প্রকাশ করে। জ্ঞাপন ক্রিয়ার যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে চিহ্নিত করে যথাসম্ভব যথাযথভাবে ব্যাখ্যাসহ উপস্থিত করে। বিভিন্ন সময়ে ও পরিস্থিতিতে জ্ঞাপনকে ব্যাখ্যা করে মডেল। জ্ঞাপনের কার্য ও গঠন সম্পর্কে সাধারণ ধারণা প্রতিষ্ঠা করে।

মডেলের সবচেয়ে জনপ্রিয় রূপটি হল SMR। এর অর্থ হল SENDER, MESSAGE, RECEIVER। এই রৈখিক মডেলটি হল এইরূপ ঃ S→ M→ R→ SENDER অর্থাৎ প্রেরক জ্ঞাপনক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রেরক একজন ব্যক্তি হতে পারে। একটি প্রতিষ্ঠানও হতে পারে। প্রেরক একটি বিশেষ বক্তব্য পৌঁছে দিতে চায় গ্রহীতা বা RECEIVE-এর কাছে। বক্তব্যটি হল MESSAGE। যে কোন জ্ঞাপন-ক্রিয়ায় এই তিনটি উপাদান থাকবেই। শিক্ষক যখন ক্লাসে পড়ান, তখন শিক্ষক হলেন S→ তাঁর বক্তব্য হল M→ এবং ছাত্ররা হল R। এই মডেলটি পরে আরও উন্নত হয় যখন এর সঙ্গে যুক্ত হয় C অর্থাৎ CHANNEL। মডেলের রূপটি হয় S→ M→ R→ বার্তা যে মাধ্যমের দ্বারা বাহিত হয়, তাই হল মাধ্যম বা CHANNEL। যেমন ক্লাসঘরে শিক্ষকের মাধ্যম হল কথা। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে মুদ্রিত লেখা।

২.৪.১ লাসওয়েল মডেল

প্রখ্যাত জ্ঞাপনবিদ হ্যারল্ড ল্যাসওয়েল (Harold Laswell) জ্ঞাপন প্রক্রিয়াকে মডেলের মাধ্যমে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। লাসওয়েল ছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক। রাষ্ট্রনেতাদের বক্তৃতা কীভাবে সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করছে তার ওপর গবেষণা চালাতে গিয়ে তিনি জ্ঞাপনতত্ত্বের নতুন মাত্রা খুঁজে পান। রাষ্ট্রনেতাদের বক্তৃতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সাধারণ মানুষের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এই বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি দেখেন SMCR জ্ঞাপনক্রিয়াকে বিশেষ রূপ দিচ্ছে, যার প্রভাবে মানুষ তথা সমাজ যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত হচ্ছে।

লাসওয়েল মডেলের মূল বিষয় হল ঃ—

কে (Who)

কাকে (Whom)

কী মাধ্যমে (What channel)

কী বলল (Said what)

এবং তার কী এবং প্রতিক্রিয়া হল (With what effect)

মডেল অনুসারে প্রথমেই দৃষ্টি দিতে হবে কে-র প্রতি। কে বার্তা পাঠাচ্ছে। বার্তা নির্ধারণ এবং নিয়ন্ত্রণ করছে কে। কে-র অবস্থান ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে বার্তার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কে বার্তা পাঠাচ্ছে, সুতরাং কে হল প্রেরক। তিনিই ঠিক করবেন কী বার্তা পাঠানো হবে। কী আলোচনা করলেই জানা যাবে বার্তার চরিত্র। বার্তার বিষয় অনুধাবনের বিষয়টিকে বলা হয় content analysis। বিশ্লেষণের মাধ্যমে বার্তার বিষয়বস্তু মর্ম-উপলব্ধি করা যায়। এরপর আসবে মাধ্যম যার মধ্য দিয়ে বার্তা গ্রহীতার কাছে পৌঁছায়। মাধ্যম জ্ঞাপন-ক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মাধ্যমের চরিত্র বিশ্লেষণ করে জানা যাবে বার্তা কীভাবে প্রেরিত হচ্ছে। মাধ্যম জ্ঞাপন-ক্রিয়াকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। মাধ্যম যদি মুখের কথা হয় তাহলে তার প্রভাব একরকম, আবার মাধ্যম যদি যন্ত্রনির্ভর হয় তবে তার প্রভাব হবে অন্যরকম। কাকে বলা হচ্ছে তাও মাধ্যমে নির্বাচনের সময় খতিয়ে দেখা হয়। 'কাকে' বলা হচ্ছে তা, হল জ্ঞাপনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মাধ্যম যার কাছে বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে তিনি গ্রহীতা। তার কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়াই হল প্রেরকের লক্ষ্য। এই গ্রহীতা একজন ব্যক্তি হতে পারে। একজন মানুষ হতে পারে। আবার ক্ষেত্র বিশেষ বহু মানুষ হতে পারে। গ্রহীতার পরিচয় জানা দরকার জ্ঞাপনকে ভালভাবে বোঝার জন্য। প্রেরক যখন বার্তা তৈরি করেন তখন গ্রহীতা কে তা অবশ্যই তিনি জানার চেষ্টা করবেন। গ্রহীতার পরিচয় জানা থাকলে সুবিধা। তার পছন্দ, চাহিদা, অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গী সবকিছুই জানা প্রয়োজন। এগুলি জানা গেলেই বার্তা সঠিকভাবে নির্ধারিত হবে এবং বোঝা যাবে ঐ বার্তা কীভাবে গৃহীত হতে পারে। শেষ স্তরটি হল প্রতিক্রিয়া। গ্রহীতা বার্তা গ্রহণ করলেই কাজ শেষ হয় না, বার্তা পাবার পর গ্রহীতার মধ্যে কোন না কোন প্রতিক্রিয়া হয়। এটাই বলে দেয় জ্ঞাপন কতদূর সার্থক হল। প্রেরক সবসময়ই চায় তাঁর বার্তা গ্রহীতার মধ্যে প্রতিক্রিয়া তৈরি করবে। প্রতিক্রিয়ার মধ্যে থেকে তৈরি হবে প্রতিবার্তা, যা প্রেরককে জ্ঞাপন-ক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হচ্ছে তা বুঝতে সাহায্য করবে। যে কোন জ্ঞাপন-ক্রিয়াকে ভালভাবে বোঝার জন্য প্রতিক্রিয়ার ভূমিকা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

লাসওয়েল যখন এই মডেলের অবতারণা করেন তখন তিনি রেখাচিত্রের সাহায্য নেননি। পারে মাইকেল বুলার (Michel Buhler) রেখাচিত্রের মাধ্যমে মডেলটিকে আরও যথাযথ ও উন্নত করেন। রেখাচিত্রটি প্রতিটি জ্ঞাপন উপাদানকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝিয়ে দেয়।

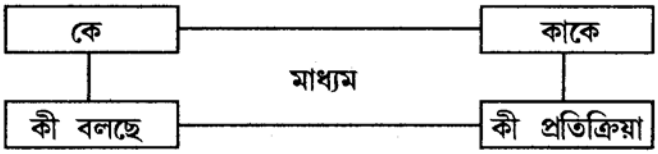

২.৪.২ শ্যানন উইভার মডেল

১৯৪৯ সালে ক্লদ ই শ্যানন এবং ওয়ারেন উইভার জ্ঞাপন-ক্রিয়াকে একটি মডেলের মাধ্যমে উপস্থিত করেন। এঁরা দুজনেই ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। নিউইয়ার্কের বেল ল্যাবরেটরিতে ফ্রিকোয়েন্সির ওপর গবেষণা করতে গিয়ে এই ইঞ্জিনিয়ারিং মডেলটি উদ্ভাবন করেন। মডেলটিতে রয়েছে চারটি উপাদান ঃ (১) তথ্য উৎস (Source of information), (২) বাহক (transmitter), (৩) গ্রাহক (receiver), (৪) গন্তব্যস্থল (destination)। এঁরা বলছেন জ্ঞাপন-ক্রিয়া চলে বাঁদিক থেকে ডান দিকে। একদম বাঁদিকে থাকছে তথ্য উৎস। তারপর বাহক, এরপর প্রেরকের কাছ থেকে সংকেত যাচ্ছে গ্রাহকের কাছে, তারপর গ্রাহকের কাছ থেকে একেবারে গন্তব্যস্থলে।

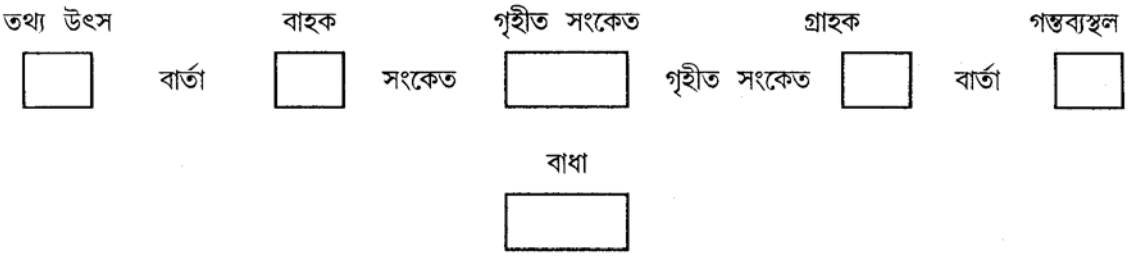

প্রথমে উৎস থেকে বাহকের কাছে বার্তা আসছে। বাহকের মাধ্যমে বার্তা সংকেতের রূপ পাচ্ছে। অর্থাৎ বার্তা সংকেত রূপায়িত হয়ে গ্রাহকের দিকে ধাবিত হচ্ছে। বার্তা প্রেরণের সময় এই পর্যায় তৈরি হয় বাধা বা নয়েজ। এর ফলে সংকেত সামান্য বিকৃতি ঘটতে পারে। বার্তা বাহকের কাছে আসার পরই এই নয়েজ বা বাধার সৃষ্টি হয়। প্রেরক চাইছেন না। কিন্তু বার্তা যখন সংকেতে রূপায়িত হচ্ছে তখন অনিবার্যভাবে যুক্ত হচ্ছে এই বাধা। এর ফলে গ্রাহকের পক্ষে সংকেত বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। কারণ গৃহীত সংকেতের মধ্যে থাকছে বাধা। গ্রাহক ইচ্ছে করলে এই বাধা বাদ দিতে পারেন না। ফলে সংকেত বুঝতে তাঁর সামান্য অসুবিধা হয়। প্রযুক্তিকে প্রেক্ষাপটে রেখেই এই মডেল তৈরি হয়েছে। প্রযুক্ত বার্তা প্রেরণের পদ্ধতিতে নিয়ে এসেছে বিপুল পরিবর্তন। গতি ও বৈচিত্র প্রেরণ ব্যবস্থাকে উন্নত করেছে। কিন্তু উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অন্য যে বিষয়টি প্রেরণ ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে দাড়িয়েছে তা হল বাধা বা নয়েজ। বেতার তরঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকা নয়েজ যেমন সম্প্রচারকে ব্যহত করে, ঠিক তেমনি আধুনিকতম উপগ্রহ সম্প্রচার ব্যবস্থাতেও নয়েজ বাধা সৃষ্টি করতে পারে। ব্যাপকতর অর্থে এই নয়েজ পারস্পরিক এবং দলগত জ্ঞাপনেও দেখা দিতে পারে। ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত ব্যবধান নিয়ে বাধা সৃষ্টি করে জ্ঞাপন-ক্রিয়ার বিঘ্ন ঘটাতে পারে। প্রেরক চাইছে না, কিন্তু প্রেরণের সময় বাধা তৈরি হচ্ছে। ফলে গ্রহীতা পুরোপুরি বার্তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে না।

যে জ্ঞাপনে প্রযুক্তিগত কলাকৌশলের প্রয়োগ বেশি, সেখানে বাধা বা Noise তৈরি হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি থাকে। শ্যানন-উইভার মডেলে প্রযুক্তিগত প্রয়োগের প্রাসঙ্গিকতার কথা বিবেচনা করেই বাধার উৎপত্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। শ্যানন এবং উইভার দুজনেই হলেন প্রযুক্তিবিদ। বেল ল্যাবরেটরিতে ফ্রিকোয়েন্সির

ওপর কাজ করতে গিয়ে তাঁরা দেখলেন সম্প্রচারের সময় বেতার তরঙ্গে Noise তৈরি হচ্ছে এবং তা বার্তার চরিত্র পাল্টে দিচ্ছে। পরিণামে ব্যাহত হচ্ছে জ্ঞাপন-ক্রিয়া। প্রেরক যেভাবে চাইছেন গ্রহীতা সেভাবে প্রভাবিত হচ্ছে না। কারণ Noise-এর বিপত্তিতে গ্রহীতা সংকেত ঠিকমতো পাচ্ছে না। এই মডেলটি পরবর্তীকালে শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেও Noise-এর প্রাসঙ্গিকতা খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করা গেছে। ভাষা, সংস্কৃতি, আচার আচরণ জ্ঞাপনের সময় অনেক ক্ষেত্রেই Noise তৈরি করে এবং তার ফলে বিঘ্ন ঘটে জ্ঞাপনে।

C   Noise   <u>নির্বাচিত মাধ্যমে বার্তা</u>   Noise   A

C হচ্ছে কমিউনিকেটর, অর্থাৎ প্রেরক। বার্তা পাঠানো হচ্ছে A-কে। A হল Audience বা শ্রোতা। প্রেরকের কাছ থেকে বার্তা ছাড়ার পর Noise তৈরি হচ্ছে। মাধ্যমের মধ্য দিয়ে যখন বার্তা শ্রোতার কাছে পৌঁছাচ্ছে তখনও থাকছে ঐ Noise বার্তার সঙ্গে। ফলে সংকেত সামান্য বিকৃত হচ্ছে। এই বিকৃতির জন্য সকল গ্রহীতা বার্তার অর্থ সমানভাবে বোঝে না। কারোর কাছে বার্তা অস্পষ্ট, কারোর কাছে আধা স্পষ্ট আবার কোন শ্রোতার কাছে বার্তা সঠিকভাবে পৌঁছায়।

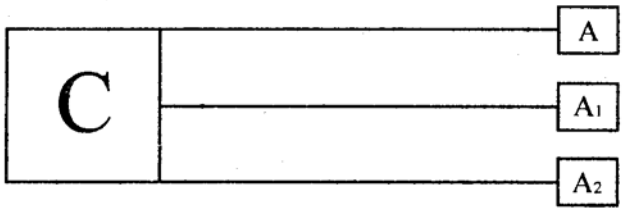

Noise বা মাধ্যম

শ্রোতা তিন ধরনের হতে পারে। A, A_1, A_2 — C অর্থাৎ Communicator যে বার্তা পাঠাচ্ছে তা A অর্থাৎ Audience তিন ভাবে বুঝছে। A পুরো বুঝতে পারছে, A_1 কিছুটা বুঝছে, আর A_2-র কাছে বার্তার অর্থ অনেকটা অস্পষ্ট।

এই বোঝার ওপর নির্ভর করছে প্রতিক্রিয়া। যদি Noise বেশি হয় তাহলে প্রতিক্রিয়া কম হবে। Noise কম হলে কিছুটা প্রতিক্রিয়া ঘটবে। প্রতিবার্তা অনুধাবন করলেই প্রতিক্রিয়ার চরিত্র বোঝা যাবে। প্রতিবার্তা দেখে প্রেরক বুঝতে পারবেন তাঁর প্রেরিত বার্তা কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে।

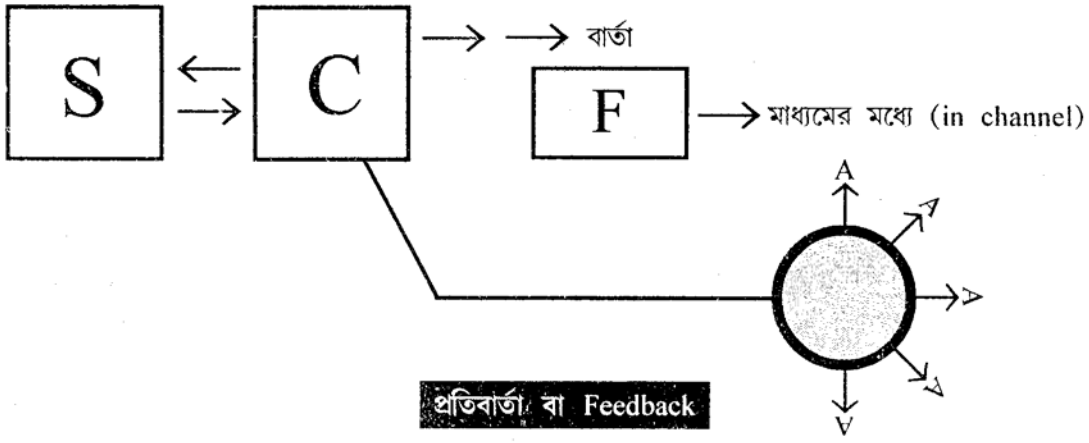

প্রতিবার্তা বা Feedback

ছবিতে প্রতিবার্তা দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন শ্রোতার (A) কাছে একটি বার্তা বিভিন্নভাবে উপস্থিত হচ্ছে পরিণামে প্রতিক্রিয়াও বিভিন্ন হচ্ছে। প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী প্রতিবার্তারও তারতম্য হচ্ছে। বিভিন্ন শ্রোতার কাছে একই বার্তা ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে।

২.৪.৩ গার্বনার মডেল

জর্জ-গার্বনার (George Gerbner) ১৯৫৬ সালে একটি মডেলের মাধ্যমে জ্ঞাপন-ক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করেন। গার্বনার জ্ঞাপনক্রিয়ার মধ্যে যে উপাদানগুলিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিলেন সেগুলি হল — উৎস (Source), কোন মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে বিশেষ পরিস্থিতিতে উৎসের প্রতিক্রিয়া (the source reacts to the event in a situation through some channel), এক বিশেষ পরিস্থিতিতে ও প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু (Subject matter in a given situation and perspective) এবং জ্ঞাপনের পরিণতি (consequences of communication)। গার্বনার জ্ঞাপনে বিশেষ পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। জ্ঞাপন কেমন হবে তা অনেকাংশে নির্ভর করে এই দুটি বিষয়ের ওপরে প্রেরক যখন বার্তা প্রেরণ করে এবং গ্রহীতা যখন তা পায় তখন তা সংঘটিত হয় এক বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে। পরিস্থিতি তৈরি হয় একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটের আধারে। গার্বনার মডেলটিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ঃ কেউ একটি ঘটনাকে বুঝে একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং তা প্রকাশিত হয় কোন একটি মাধ্যমের দ্বারা। উদ্দেশ্য থাকে এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে উপস্থিত উপকরণের সাহায্যে জ্ঞাপনের বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করা।

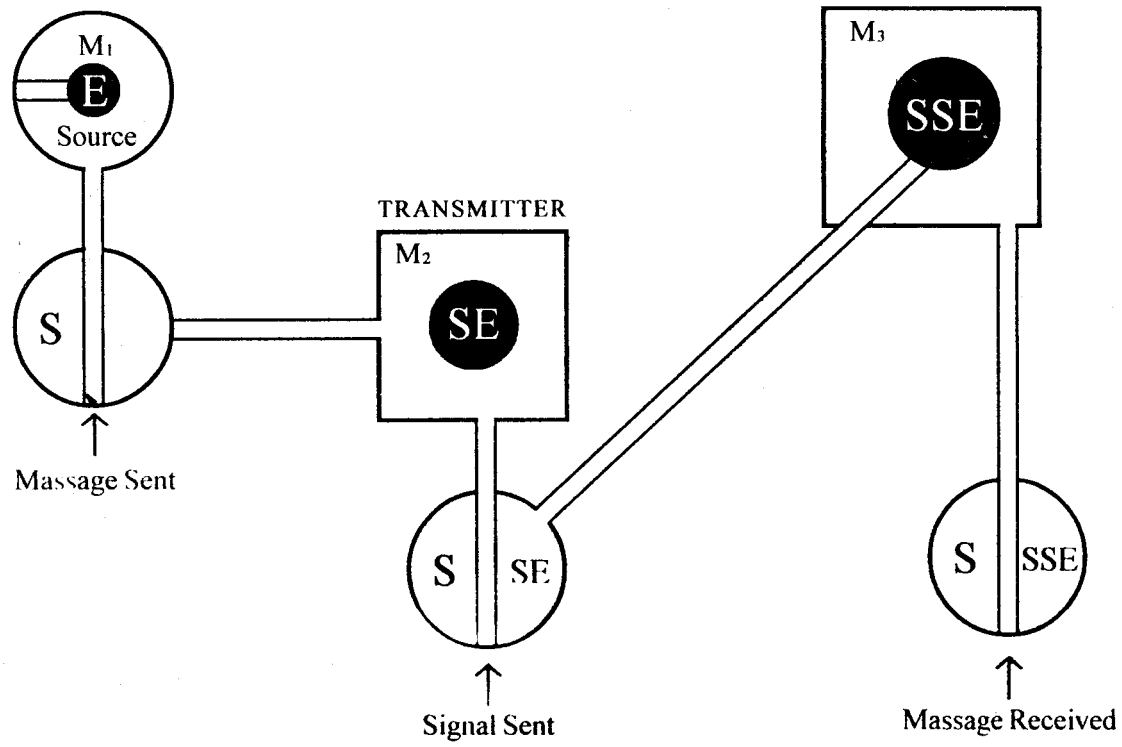

M_1 হচ্ছে উৎস। M_2 হল বাহক যন্ত্র (transmitting) আর M_3 হল গ্রহীতা। E হল M-এর দেখা ঘটনা। S হচ্ছে প্রেরিত বার্তা। SE হল ঘটনা সম্পর্কে বিবৃতি। SSE হল প্রেরিত সংকেত। যা ঐ বিবৃতি সম্পর্কে বলছে। SSEE হল গৃহীত বার্তা যা গ্রহীতা উপলব্ধি করছে। এই মডেল শ্রাব্য-দৃশ্য (audio-visual) জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক। টেলিভিশনে যে অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় তা মডেলে বর্ণিত প্রতিটি স্তরকেই ছুঁয়ে যায়। বাহক যন্ত্রের মধ্য দিয়ে শ্রাব্য ও দৃশ্য সংকেতের মাধ্যমে একটি ঘটনা সম্পর্কে যে বিবৃতি দর্শকের কাছে উপস্থাপিত হয় তা দর্শক মনন দিয়ে, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে। পরিস্থিতি ও প্রেক্ষিত এই জ্ঞাপনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

২.৪.৪ নিউকম্ব মডেল

লাসওয়েল, গার্বনার, শ্যানন-উইভার যে মডেলগুলির অবতারণা করেছিলেন তা মূলত ছিল রৈখিক মডেল। কিন্তু থিওডোর নিউকম্ব (Theodore Newcomb) যে মডেল উপস্থিত করলেন তার চরিত্র পূর্বোক্ত মডেলগুলির থেকে একেবারে আলাদা। সামাজিক প্রেক্ষায় তিনি জ্ঞাপনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেছেন। সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারণে জ্ঞাপন একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এটা প্রমাণ করাই ছিল নিউকোম্ব মডেলের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। এই মডেল অনুসারে সমাজে ভারসাম্য বজায় রাখতে জ্ঞাপন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

A এবং B হল যথাক্রমে প্রেরক এবং গ্রহীতা। প্রেরক ও গ্রহীতার ভূমিকায় ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, পরিচালন গোষ্ঠী অথবা জনগণও থাকতে পারে। X হল প্রেরক ও গ্রহীতার সামাজিক পরিবেশ। ABX হল একটি ব্যবস্থা যার মধ্যে গভীর আন্তসম্পর্ক বজায় রয়েছে।

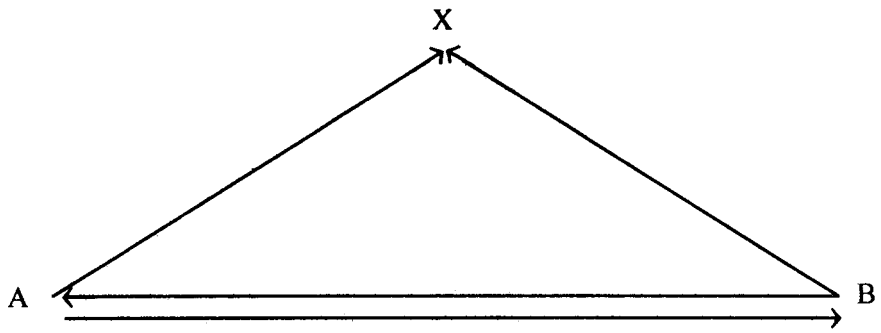

যদি A পরিবর্তিত হয় তাহলে X এবং B-ও পরিবর্তিত হবে। অন্যভাবে বলা যায় A যদি X-এর সঙ্গে তার সম্পর্ক বদলায়, তাহলে B-কেও X-এর সঙ্গে সম্পর্ক বদলাতে হবে। এর অর্থ হল A এবং B-র মধ্যে রয়েছে বন্ধুত্ব যা X-কে প্রভাবিত করছে। লক্ষ্য করার বিষয় এর মধ্যে দিয়ে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার একটা প্রচেষ্টা রয়েছে। অপরদিকে এমনও হতে পারে A X-কে পছন্দ করে, কিন্তু B-কে করে না। এ অবস্থায় A এবং B-কে অনেক ভেবে চিন্তে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। এই যোগাযোগের অন্যতম লক্ষ্য থাকবে X-এর প্রতি সহমত বজায় রেখে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা। X-এর প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা পর্যন্ত A এবং B-কে সযত্নে নিজেদের মধ্যে জ্ঞাপন চালাতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে A হল ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ইউনিয়ন, B হল সরকার এবং X হল সরকারি নীতিতে একটি পরিবর্তন। যেমন ব্যাঙ্কের বেসরকারিকরণ। যদি A এবং B যদি পরস্পরকে পছন্দ করে, তাহলে X সম্পর্কে একমত হবার জন্য তারা

সহজেই আলোচনা চালিয়ে সহমতে আসার চেষ্টা করবে। আবার A এবং B-র মধ্যে যদি ভালো সম্পর্ক না থাকে তাহলে X সম্পর্কে সহমত হবার জন্য A এবং B-র মধ্যে সযত্ন প্রয়াস নিতে হবে। আলোচনার মাধ্যমে সন্তর্পণে সহমতের সূত্র খুঁজে নেবার চেষ্টা করতে হবে। ভারসাম্য অর্জন করাই হল প্রধান লক্ষ্য। নিউকম্ব মডেল সমাজে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার ওপরই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে।

২.৪.৫ ডান্স মডেল

ফ্রাঙ্ক ডান্স (Frank Dance) এই মডেলটি ১৯৬৭ সালে উপস্থাপন করেছিলেন। জ্ঞাপন সর্বদাই মানবিক এটা ধরে নিয়েই ডান্স এই মডেলে জ্ঞাপনকে এক বিরামবিহীন প্রক্রিয়া বলে বর্ণনা করেছেন। চক্রাকারে চলতে থাকে জ্ঞাপন-ক্রিয়া এক স্তর থেকে আরেক স্তরে।

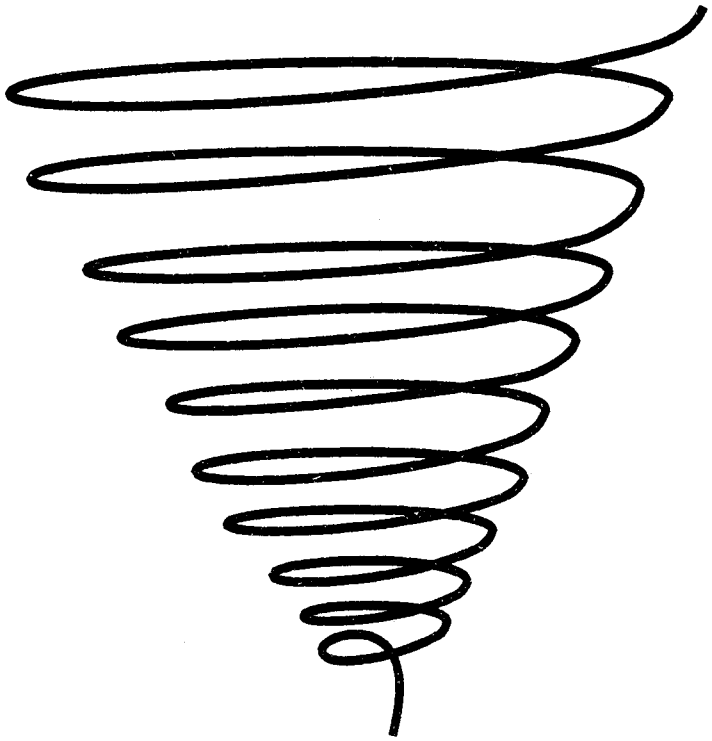

ডান্স তাঁর মডেলে দেখিয়েছেন জ্ঞাপনের কোন নির্দিষ্ট শুরু বা শেষ নেই। চক্রাকারে বিরামবিহীন জ্ঞাপনক্রিয়া ঘটেই চলে। কোন নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে জ্ঞাপনক্রিয়া আবদ্ধ থাকে না। এখন যা ঘটছে তার সঙ্গে আগে ঘটে যাওয়া জ্ঞাপনের যোগ রয়েছে। ঠিক একইভাবে বর্তমান জ্ঞাপন-ক্রিয়া ভবিষ্যৎ জ্ঞাপন-ক্রিয়াকে প্রভাবিত করবে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে চক্রাকারে পেঁচিয়ে নীচের দিকে ক্রমশ ছোট হয়ে প্রতীক জ্ঞাপন-ক্রিয়া নেমে আসছে। জ্ঞাপন-ক্রিয়া সবসময়ই খুব সহজ সরল ব্যাপার নয়। নানান ধরনের বিষয় প্রভাবিত করে জ্ঞাপনকে। চক্রাকার গতি এই জটিলতাকে প্রতিষ্ঠা করে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও প্রমাণ করে যে জ্ঞাপন-ক্রিয়া সর্বদাই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে

চলেছে। প্রতি স্তরেই জ্ঞাপন উন্নত হচ্ছে, বিকশিত হচ্ছে তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে। একটি জ্ঞাপন থেকে উদ্ভূত হচ্ছে অন্য একটি জ্ঞাপনের ধারা। এভাবেই চলছে, অতীত থেকে বর্তমান, তারপর ভবিষ্যৎ জ্ঞাপন-ক্রিয়ার ধারাবাহিকতা।

২.৪.৬ ওয়েসলি এবং ম্যাকলিন মডেল

বি. এইচ. ওয়েসলি এবং এম.এস.ম্যাকলিন ১৯৫৭ সালে এই মডেলটির অবতারণা করেছিলেন। জ্ঞাপন-ক্রিয়ার মধ্যে যে গভীর আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে তা যথাযথভাবে উপস্থিত করাই ছিল এই মডেলটির উদ্দেশ্য। মডেলটিকে ABX মডেল বলে চিহ্নিত করা হয়। X হল বিষয়, A হল জ্ঞাপক এবং B হল গ্রহীতা।

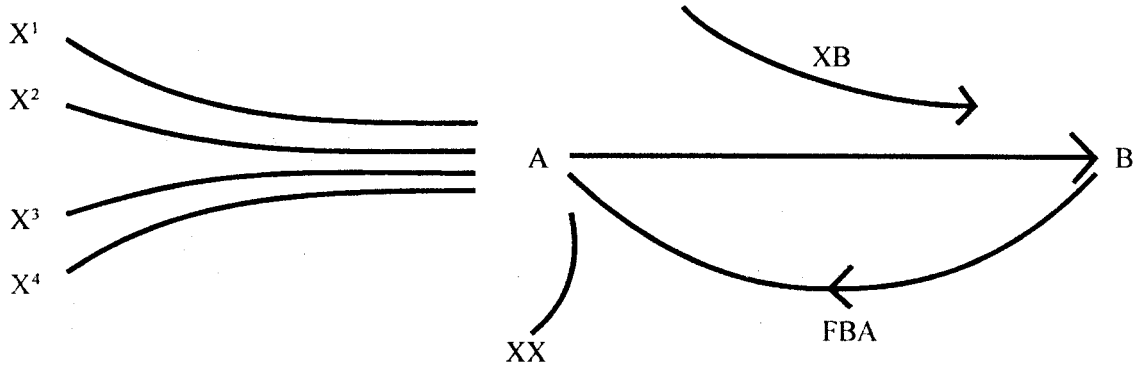

বিভিন্ন উৎস থেকে উপকরণ নিয়ে A নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বার্তা গঠন করছে। তারপর তা B-কে পাঠাচ্ছে। তারপর B বার্তাগ্রহণ করে প্রতিবার্তার মাধ্যমে তার প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে। এই প্রতিবার্তা তৈরির সময় B-র মনস্তাত্ত্বিক পরিমন্ডল তথা গঠন সক্রিয় থেকে প্রতিবার্তাকে প্রভাবিত করে। X বিষয় বিভিন্ন সূত্র থেকে উঠে আসে। একজন যখন বার্তা গঠন করে তখন তার উপাদান উঠে আসে বিভিন্ন সূত্র থেকে। অর্থাৎ সূত্র সম্ভাবনার ক্ষেত্র অনেক বড় থাকে। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত উপাদান থেকে এক বিশেষ আর্থ-সামাজিক অবস্থানের মধ্যে দাঁড়িয়ে A তার বার্তা গঠন করে। জার্মান দার্শনিক কান্ট বলেছিলেন সমস্ত কিছুই আমরা দেখি আমাদের ধ্যানধারণা দিয়ে (We see everything with our own perceptions)। কান্টের বক্তব্য এই মডেলে খুবই প্রাসঙ্গিক। A বার্তা গঠনের সময় X^1, X^2, X^3, X^4 সূত্র থেকে উপকরণ নিচ্ছে। তারপর নিজের ধ্যানধারণা ও বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী ঐ সব উপকরণকে বার্তাগঠনের কাজে লাগাচ্ছে। আবার B বার্তা গ্রহণ করছে নিজস্ব বিচারবুদ্ধির প্রেক্ষিতে। A এবং B-র বিচারবুদ্ধি উঠে আসছে পরিবেশ থেকে। A চাইছে B-র ধারণাকে পরিবর্তন করতে। B কতটা পরিবর্তিত হবে তা নির্ভর করছে B-র নিজস্ব ধারণার ওপর। XB হল B-র নিজস্ব ধারণাসূত্র। A-র মতন B-রও কিছু সূত্র রয়েছে। এই সূত্রগুলি B-র গ্রহণ ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। পরিবেশ থেকে উঠে আসা XB সূত্রগুলি ঠিক করবে B-র প্রত্যুত্তর বা প্রতিবার্তা কী রকম হবে। এই প্রতিবার্তা A যেমন চাইছে সেরকম নাও হতে পারে। B-র কাছ থেকে যে প্রতিবার্তা আসছে তা হল FBA। এই FBA বিচার করলে বোঝা যাবে B কীভাবে A বার্তা গ্রহণ করেছে এবং ঐ বার্তা কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে B-র মধ্যে।

পরবর্তীকালে এই মডেলে C-কে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। C গেটকীপারের ভূমিকা নেয়। জ্ঞাপনবিদ লিউইন (Lewin) C-কে নিয়ে আসেন গেটকীপারের বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। গণমাধ্যমের দ্বারা যে জ্ঞাপন হচ্ছে তা বোঝাতে C-র ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। গণমাধ্যমের প্রসার যত ঘটছে তত C-র অস্তিত্ব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

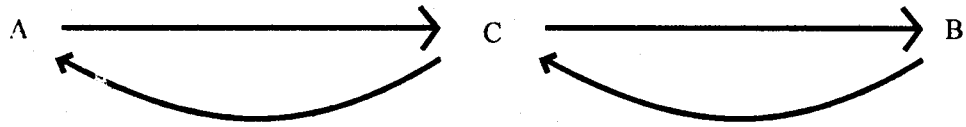

প্রতিবার্তা A সরাসরি যায় না। C-র কাছ থেকে তা গ্রহণ করতে হয়। B-র প্রতিবার্তা গ্রহণ করে C। তারপর তা যায় A-র কাছে।

২.৪.৭ অসগুড মডেল

সি. ই. অসগুড (C. E. Osgood) উইলবার চক্র মডেলকে আরও সুসংহত করে একটি নতুন মাত্রা দিয়েছিলেন। কতকগুলি বক্স এবং তীরচিহ্ন ব্যবহার করে ডান্স প্রবর্তিত চক্রাকার মডেলের অনুকরণে তিনি Noise এবং ব্যক্তিত্বের প্রভাবকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছিলেন। অসগুড মডেলের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল বিরামবিহীন জ্ঞাপনক্রিয়ায় ক্রমশ Noise-এর পরিমাণ কমতে থাকে এবং ব্যক্তিত্বের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। পরস্পরকে জানার সুযোগ যত বাড়বে, পরস্পরের ধারণার এবং দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার তাগিদও বাড়বে। এর বলে জ্ঞাপন ও গ্রহীতার মধ্যে দূরত্ব কমে আসবে। একজন আরেকজনকে যতভালোভাবে বুঝবে ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব তত বৃদ্ধি পাবে। চক্রাকারে জ্ঞাপন ক্রিয়া যত নিচের দিকে নামবে ব্যক্তিত্বের বক্স তত বড় হবে এবং Noise-এর বক্স ক্রমশ ছোট হবে।

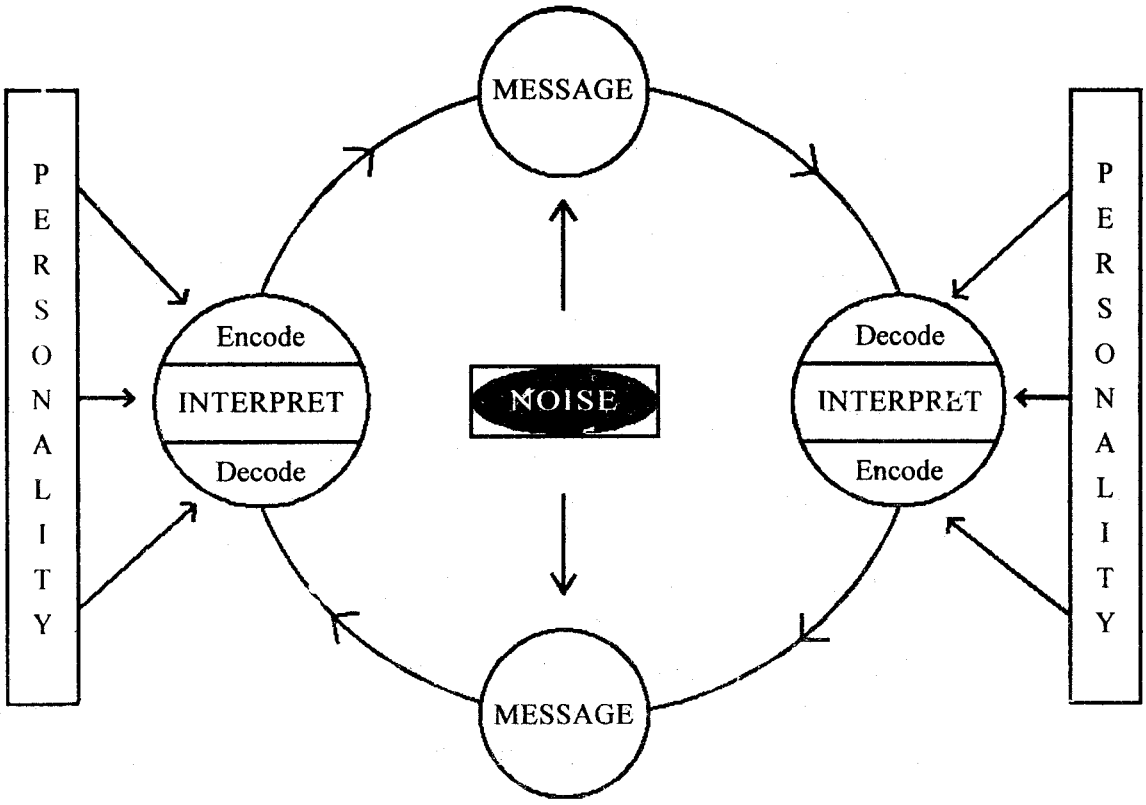

২.৫ জ্ঞাপন ও সামাজিকীকরণ

জ্ঞাপনের সঙ্গে সামাজিকীকরণে গভীর যোগ রয়েছে। জ্ঞাপনের মাধ্যমেই মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে এবং অপরকে জানার সুযোগ পায়। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে, বন্ধুদের সঙ্গে এবং সমাজের বিভিন্ন মানুষজনের সঙ্গে পারস্পরিক জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে যোগাযোগ তৈরি হয়। প্রাথমিকভাবে মুখের ভাষায় চলে এই জ্ঞাপন। পরিবার প্রতিষ্ঠানটি দাঁড়িয়ে আছে মূলত এই ধরনের জ্ঞাপনের ওপর নির্ভর করে। স্কুল, কলেজ ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানেও পারস্পরিক জ্ঞাপনের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

দলগত জ্ঞাপনের প্রভাবও রয়েছে সামাজিকীকরণ। মুখের কথাকে আশ্রয় করে সামাজিক মেলামেশা চলে। আড্ডায়, আলোচনায় ক্রমাগত ঘটে চলে মতামত এবং ভাবনার আদান-প্রদান। সামাজিক অভ্যাস সংস্কৃতি, নীতি ও মূল্যবোধ গঠিত হয় এই জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে। পারস্পরিক ও দলগত জ্ঞাপন সামাজিকীকরণকে শুধুমাত্রা বাস্তবায়িত করে না। এই প্রক্রিয়ার যোগ করে নিত্য নতুন মাত্রা। মানুষের ব্যক্তিত্ব অর্জনে এবং সমাজের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে জ্ঞাপন খুবই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

গণজ্ঞাপনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিকীকরণ আরও দ্রুত হতে থাকে। ব্যাপকতর হয় তার পরিধি। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, বই, বেতার, টেলিভিশন সাধারণ মানুষের কাছে ভীষণভাবে জনপ্রিয় হয়েছে। উনিশ শতকের শেষদিকেই সমাজবিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করেন সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ও বই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এগুলি মানুষের সামাজিক অবস্থানে নিয়ে আসছে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। যোগাযোগের নতুন বাহন হিসেবে সমাজ ও জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার মাত্রা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী চার্লস হর্টন বলেন চারটি কারণে নতুন গণমাধ্যমগুলি সমাজের ওপর বিপুল প্রভাব ফেলেছিল। সেগুলি হল প্রকাশ, স্থায়িত্ব, দ্রুততা ও বিস্তৃতি। এ ছাড়া মাধ্যমগুলি অনেক বেশি গণতান্ত্রিক। সকল শ্রেণীর মানুষ সহজে এই মাধ্যমগুলি ব্যবহার করতে পারে। স্বাক্ষরতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ মাধ্যমগুলির সংস্পর্শে এসে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল হয়েছে।

রেডিও ও টেলিভিশন আসার পর গণমাধ্যমের সামাজিক প্রভাব বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর প্রধান কারণ ছিল এই দুটি গণমাধ্যমের দারুণ জনপ্রিয়তা। শুধুমাত্র তথ্য সরবরাহ নয়, বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে রেডিও ও টেলিভিশন সাধারণ মানুষের মন দ্রুত জয় করেছিল। সিনেমার আবির্ভাবের পর গণমাধ্যমের সামাজিক প্রভাব হয়েছিল আরও বহুদূর বিস্তৃত। সিনেমা হয়ে উঠেছিল সাধারণ মানুষের সবচেয়ে প্রিয় বিনোদন মাধ্যম। ভিডিও স্যাটেলাইট চ্যানেল ও কম্পিউটার আসার পর গণমাধ্যমের চালচিত্রটাই বোল একেবারে পাল্টে মানুষ ইচ্ছেমতো যে কোন অনুষ্ঠান বাড়িতে বসে দেখার সুযোগ পেল। সামাজিকীকরণে নতুনমাত্রা যোগ করল প্রযুক্তি নির্ভর এই নতুন গণমাধ্যম। এই মাধ্যমগুলি শ্রোতা-দর্শকের বিশ্বাস। দৃষ্টিভঙ্গী বা আচরণকে যে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই।

গণজ্ঞাপনের প্রভাবে সমাজে ঘটে চলেছে বিরামবিহীন পরিবর্তন। তৈরি হচ্ছে নতুন সামাজিক অবয়ব, সংস্কৃতির নতুন রূপ। মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গী দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে। গণমাধ্যমকে আশ্রয় করেই তৈরি হয়েছে সাংস্কৃতিক রূপান্তর। গণ সংস্কৃতির উদ্ভব এভাবেই ঘটেছে।

আধুনিক গণমাধ্যম মানুষের চিন্তার, ভাবনার ও আচরণে এমন একটা যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করছে যার দ্বারা একজন আরেকজনের ভাবনার অংশীদার হয়ে উঠছে। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্তরে যোগাযোগ নয়। সমাজ, দেশ ও কালের সঙ্গেও যোগাযোগ তৈরি হচ্ছে মানুষে। প্রকৃতপক্ষে এই যোগাযোগই বাস্তবায়িত করছে পারস্পরিক বোঝাপড়া। লক্ষ্য করার বিষয় এই বোঝাপড়া কিন্তু তৈরি হচ্ছে গণমাধ্যমের মধ্য দিয়ে। গণমাধ্যমের অস্বাভাবিক

অগ্রগতির ফলে মানুষের সামাজিক মেলামেশার অভ্যাস কমছে। অফিস আর বাড়ি এর মধ্যেই তার পরিধি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। বাড়ি ফিরে টেলিভিশনের সামনে বসেই তার সময় কেটে যায়। কাছের দূরের সব ঘটনাই সে দেখে টেলিভিশনের পর্দায়। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য একমাত্র নির্ভর হয়ে দাঁড়ায় টেলিভিশন। এছাড়া আছে কম্পিউটার। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইচ্ছেমত স্বাধীনভাবে সে যে কোন প্রান্তের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। দুটি ঘটনা একই সাথে ঘটছে। একদিকে যেমন পছন্দমাফিক যোগাযোগের সম্ভাবনা বিস্তৃত হয়েছে। অপরদিকে ঠিক তেমনি ব্যক্তিগতস্তরে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ অনেক কমে আসছে। কিন্তু জানার পরিধি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবেশীর খোঁজ না রাখলেও অনায়াসে বিশ্বপল্লীর বাসিন্দা হয়ে যাচ্ছে মানুষ।

সমাজ যত আধুনিক হচ্ছে মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা তত বাড়ছে। মানসিক দিক দিয়ে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে মানুষ। কিন্তু বিশ্বের সঙ্গে তার যোগাযোগ বাড়ছে। মানুষ সম্পূর্ণভাবে যোগাযোগের জন্য গণমাধ্যমগুলির উপরই নির্ভর করছে। সামাজিক বন্ধন আলাদা, কিন্তু গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রসার ঘটছে। এ এক অদ্ভূত সামাজিকীকরণ। রুচি, অভ্যাস, দৃষ্টিভঙ্গী সবকিছুই তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি উন্নত দেশগুলিতে গণসমাজের অস্তিত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্বায়ণ যত ঘটবে, গণমাধ্যমের ওপর যত বেশি মানুষ নির্ভরশীল হবে ততই পাকাপোক্ত হবে গণসমাজের ভিত।

২.৬ সারাংশ

জ্ঞাপন-ক্রিয়ায় প্রতিবার্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবার্তা বিশ্লেষণ করেই জানা যাবে জ্ঞাপন কতখানি সফল হচ্ছে। প্রতিবার্তা সদর্থক, নঞর্থক দুই-ই হতে পারে। গণজ্ঞাপনে প্রতিবার্তার গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে।

জ্ঞাপন মডেল জ্ঞাপন ক্রিয়াকে ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করে। জ্ঞাপনক্রিয়ার মধ্যে যে বিভিন্ন উপাদানগুলি পারস্পরিক সম্পর্কের বিন্যাসের মধ্য দিয়ে জ্ঞাপন ক্রিয়াকে সার্থক করে তোলে তা যথাযথভাবে রেখাচিত্রের মাধ্যমে উপস্থিত করাই মডেলের কাজ। জ্ঞাপনবিদরা গবেষণা করে এই মডেলগুলি প্রবর্তন করেছেন। প্রথম মডেলের সন্ধান পাওয়া যায় আরস্তওলের রচনায়। পরবর্তীকালে যে সমস্ত মডেলগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে। লাসওয়েল মডেল, শ্যানন উইভার মডেল, গার্বনার মডেল, ডান্সমডেল, নিউকম্ব মডেল ওসগুড মডেল এবং ওয়েসলি মডেল এই মডেলগুলোর মধ্যে খুবই উল্লেখযোগ্য।

জ্ঞাপন সামাজিকীকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। পরিবারের সদস্য বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে পারস্পরিক যোগাযোগের মধ্য দিয়ে মানুষ আত্মস্থ করে মূল্যবোধ, নীতিশিক্ষা, আচার ব্যবহার ইত্যাদি। গণমাধ্যমের সংস্পর্শে এসে এই সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া আরও প্রসারিত হয়। আধুনিক গণমাধ্যম সামাজিকীকরণ এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে সমাজ-সংস্কৃতির ধারণাই গেছে বদলে। গণসমাজের আবির্ভাব বিশ্বায়ণের ভাবনা যেমন পোক্ত হয়েছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ তেমনি আলাদা হয়ে এসেছে। সামাজিকীকরণ মানুষকে সম্পূর্ণভাবে গণমাধ্যমগুলির ওপর নির্ভরশীল করে তুলেছে।

২.৭ অনুশীলনী

১) প্রতিবার্তা কাকে বলে? প্রতিবার্তা কত ধরনের হয়? সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

২) জ্ঞাপনে মডেলের গুরুত্ব কী?

৩) যে কোন একটি মডেল আলোচনা করুন ঃ—

ক) লাসওয়েল মডেল

খ) গার্বনার মডেল

গ) শ্যানন-উইভার মডেল

ঘ) নিউকম্ব মডেল

ঙ) ডান্স মডেল

চ) ওয়েসলি মডেল

৪) জ্ঞাপনের সামাজিকীকরণ সম্পর্কে যা জানেন সংক্ষেপে লিখুন।

২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১) গণজ্ঞাপন ঃ ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়

২) জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম ঃ ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

৩) Mass Communication Theory and Practice : Uma Narula

৪) Communication Theory Today : *Edited by :* David Crowley & David Mitchell

৫) গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী (অনুবাদ) ঃ মেলভিন এল. ডি. ফ্লার
স্যান্ড্রা জেবল-রোকেক। *(বাংলা আকাদেমী ঃ ঢাকা)*

একক ৩ □ গণমাধ্যম তত্ত্বাবলী

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ গণমাধ্যম তত্ত্ব

৩.৩ গণজ্ঞাপন ও গণমাধ্যম

৩.৪ গণমাধ্যম তত্ত্বের বিভিন্ন রূপ

৩.৫ সংবাদপত্রের চারটি তত্ত্ব

৩.৬ গণমাধ্যম ও জনমত

৩.৭ বাণিজ্য ও বিপণনে গণমাধ্যম

৩.৮ সারাংশ

৩.৯ অনুশীলনী

৩.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককে গণমাধ্যম সম্পর্কিত বিবিধ প্রাসঙ্গিক বিষয় আলোচিত হবে। গণমাধ্যমের কার্যধারা। তাত্ত্বিক ধারণা, সমাজে গণমাধ্যমের ভূমিকা যথাসম্ভব সহজে বলা হবে। যাতে ছাত্রছাত্রীরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারে। প্রয়োজনে উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হবে বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা। যে বিষয়গুলি আলোচিত হবে সেগুলি হল ঃ

- গণমাধ্যম তত্ত্ব
- গণমাধ্যমের দায়বদ্ধতা
- গণমাধ্যম ও জনমত
- বিভিন্ন তত্ত্বের রূপ
- উন্নয়ন তত্ত্ব
- বাণিজ্য ও বিপণনে গণমাধ্যম

৩.১ প্রস্তাবনা

গণমাধ্যমের বিপুল সামাজিক প্রভাব রয়েছে। সংবাদপত্র, বইপত্র, সাময়িকপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র মানুষের মানসিক ও ব্যবহারিক আচরণকে প্রভাবিত করে। এই সামাজিক প্রভাবের কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন তাত্ত্বিক রূপরেখা, যা গণমাধ্যমের ভূমিকা সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিশদভাবে আলোচনা করে। গণজ্ঞাপনের

কার্যপ্রক্রিয়া, গণমাধ্যমের সামাজিক দায়বদ্ধতা, উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা ও আধুনিক অর্থনৈতিক অবস্থায় গণমাধ্যমের প্রাসঙ্গিকতা আলোচিত হবে এই এককে।

৩.২ গণমাধ্যম তত্ত্ব

গণমাধ্যমের কার্যধারাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে গণমাধ্যম তত্ত্ব। সমাজে গণমাধ্যমের প্রভাব যত বৃদ্ধি পেয়েছে, তাত্ত্বিক রূপরেখার চিত্রও তত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, বইপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, ভিডিও, চলচ্চিত্র হল গণমাধ্যম। এই মাধ্যমগুলির ভূমিকা সমাজে কী প্রভাব ফেলছে এবং এই প্রভাবের অধীনে সমাজ কীভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে তাই উঠে আসে গণমাধ্যমের তাত্ত্বিক আলোচনায়। জ্ঞাপন আসে গণমাধ্যমের তাত্ত্বিক আলোচনায়। জ্ঞাপন ব্যক্তিগত স্তরে যেভাবে ঘটে, গণজ্ঞাপনের স্তরে সেভাবে ঘটে না। গণমাধ্যমের আবির্ভাবের ফলে দ্রুত বহু মানুষের মধ্যে বার্তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। একই বার্তা মুহূর্তের মধ্যে কোটি কোটি মানুষের কাছে ছড়িয়ে পড়ছে। তথ্য সঞ্চলনে, দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামতের দ্রুত সম্প্রচার গণমাধ্যমের ভূমিকা ও তার তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব সমাজবিজ্ঞানের আলোচনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিশ্লেষণে, ব্যাখ্যায়, উপলব্ধিতে নতুন নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। গণমাধ্যম-বিশেষজ্ঞরা গবেষণা চালিয়ে গণমাধ্যমের কার্যধারা ও তার সামাজিক প্রভাবকে বিশ্লেষণ করে, ব্যাখ্যা করে এবং যুক্তিযুক্তভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে বিভিন্ন তাত্ত্বিক রূপরেখা তৈরি করেছেন। সাম্প্রতিক গবেষণায় গণমাধ্যমের কার্যপ্রক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্পর্কগুলি বিস্তৃত হয়েছে। গণমাধ্যমের সঙ্গে সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের। রাজনীতি ও অর্থনীতির ঘনিষ্ঠ আন্তঃসম্পর্কগুলি অনুসন্ধান করে দেখার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। এর ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে নতুন সূত্র, নতুন প্যারাডাইস।

গণমাধ্যম তত্ত্বের চারটি প্রধান ধারা রয়েছে। প্রথম ধারাটি গণমাধ্যমের স্বাধীন অস্তিত্বের ওপর গুরুত্ব দেয়। গণমাধ্যম চতুর্থ এস্টেটের মত প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। স্বাধীনভাবে তথ্য পরিবেশন করছে। দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামত সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে। সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে গণমাধ্যম তার স্বাধীন সত্তা টিকিয়ে রেখেছে।

দ্বিতীয়ত, সরকার অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা জনগোষ্ঠীর কোন অংশ যাতে প্রভূত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠে স্বৈরতান্ত্রিক না হয়ে পড়ে তার জন্য সদাসর্বদা সচেষ্ট থাকে গণমাধ্যম। স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা দেখা দিলেই গণমাধ্যম তাঁর বিরোধিকা করে। এর ফলে ক্ষমতার সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রিত হয়। ভারসাম্য বজায় থাকে।

তৃতীয়ত, গণমাধ্যমকে আদর্শগত প্রতিষ্ঠান বলে মনে করা হয়। গণমাধ্যম উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ভাবধারার দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের গণমাধ্যম প্রধানত উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ভাবধারাই প্রচার করে। আবার কোন কোন দেশে গণমাধ্যম সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার দ্বারা পরিচালিত হয়। উদাহরণস্বরূপ চীন, রাশিয়া, কিউবার গণমাধ্যমের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রেণীস্বার্থ বজায় রেখে প্রচলিত স্থিতাবস্থা বজায় রাখার ব্যাপারে যেমন গণমাধ্যম সচেষ্ট হতে পারে। তেমনি শ্রেণীস্বার্থ অবসানের লক্ষ্যেও চালিত হতে পারে।

চতুর্থত, গণমাধ্যম গণসমাজের ধারণার উদ্ভবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একদিকে মানুষ বহির্বিশ্বের যোগাযোগের জন্য গণমাধ্যমের ওপরই একমাত্র নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে সমাজ থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আবার সমাজের মধ্যে দুটি ধারার অস্তিত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একদিকে বিপুল শ্রমজীবী জনগোষ্ঠী যার মধ্যে শ্রমিক, মধ্যবিত্ত ব্যবহারজীবীরা রয়েছে, অন্যদিকে এলিট শ্রেণী, যাঁরা সংখ্যায় কম হলেও, সমাজ পরিচালনায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গণমাধ্যম এই দুটি শ্রেণীকেই যথাসম্ভব পরিষেবা পৌঁছে

দেয়। এমন বাস্তব পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যাতে সকলকেই গণমাধ্যমের ওপরই তথ্য ও মতামতের জন্য নির্ভর করতে হয়।

গণমাধ্যমের নিজস্ব মতাদর্শও রয়েছে। গণমাধ্যমের কার্যধারার সঙ্গে এই মতাদর্শের সম্পর্ক গভীর। কীভাবে গণমাধ্যম কাজ করবে তা নির্ভর করে গণমাধ্যমের মালিকানা ও পরিচালনগত বিন্যাসের ওপরে। গণমাধ্যমের মালিকানা যদি পুঁজিপতিদের হাতে থাকে তাহলে গণমাধ্যমের পরিচালনায় মুনাফাই হবে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। বাজার অর্থনীতির নিয়মে যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মতো লাভ-ক্ষতির অঙ্ক কষে টিকে থাকতে চাইবে। আবার সরকার, সমবায় বা দলীয় পরিচালনায় টিকে থাকার উদ্দেশ্য হবে অন্যরকম। মুনাফা নয়, বিশেষ ধরনের প্রচার ও স্বার্থরক্ষাই হবে প্রধান উদ্দেশ্য। অর্থ-সামাজিক বাস্তবতা নির্মাণে গণমাধ্যমের মতাদর্শ উল্লেখজনক ভূমিকা পালন করে।

৩.৩ গণজ্ঞাপন ও গণমাধ্যম

গণজ্ঞাপণ ক্রিয়া বাস্তবায়িত হয় গণমাধ্যমের দ্বারা। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, রেডিও, টেলিভিশন জ্ঞাপন-ক্রিয়ার পরিধি বহুদূর বিস্তৃত করেছে। পরিকল্পিত বার্তাকে পৌঁছে দিয়েছে একইসঙ্গে লক্ষকোটি মানুষের কাছে। গণজ্ঞাপন প্রক্রিয়ার প্রধান আশ্রয়ই হল গণমাধ্যম। গণমাধ্যমের অগ্রগতি গণজ্ঞাপন চর্চার পরিধিকেও প্রসারিত করেছে। গণজ্ঞাপন চর্চার পরিণতি হিসেবে গড়ে উঠেছে গণমাধ্যম তত্ত্ব ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান। গণজ্ঞাপনের মডেলে, তাত্ত্বিক প্যারাডাইসে গণমাধ্যমের কার্য ও প্রভাবই মুখ্য আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। গণজ্ঞাপনের আলোচনা গণমাধ্যমের আলোচনা ছাড়া হতে পারে না। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, ভিডিও এবং চলচ্চিত্রের সামগ্রিক চর্চার পরিপ্রেক্ষিতে গণজ্ঞাপন চর্চার রূপরেখা তৈরি করে।

৩.৪ গণমাধ্যম তত্ত্বের বিভিন্ন রূপ

গণমাধ্যম তত্ত্বকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে দেখা হয়। গণমাধ্যমের কার্যধারা ও তার সামাজিক প্রভাব বিবেচনা করেই এই বিভাজন করা হয়। সমাজের মধ্যে যে সমস্ত জনগোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার সঙ্গে গণমাধ্যমের আন্তসম্পর্ক সমাজবাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠা করছে। এই সম্পর্কের সূত্র ধরেই তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন তাত্ত্বিক আধার ও বিন্যাস, যা গণমাধ্যমের চরিত্র ও তার সঙ্গে সামাজিক জীবনযাপনের আন্তঃসম্পর্ক পর্যালোচনা করে। কখনই শুধুমাত্র নিয়মনিষ্ঠ ব্যবস্থায় পরিধির মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, তত্ত্বের মধ্যে প্রতিফলিত হয়, যুক্তিসিদ্ধ ভাবনা এবং ধারণার রূপ যা সর্বদিক দিয়ে একটি পরিস্থিতিকে বুঝতে সাহায্য করে, কার্যধারাকে সঠিকপথে পরিচালিত করতে পারে এবং সম্ভাব্য কোন বিশেষ পরিণতির আভাষ দিতে পারে। গণমাধ্যম তত্ত্বের মধ্যেও তত্ত্বের এই সর্বজনীন রূপটির সন্ধান পাওয়া যায়। গণমাধ্যম তত্ত্বকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

এই চারটি রূপ হল ১) সামাজিক-বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব (Social Scientific Theory), ২) আদর্শমূলক তত্ত্ব (Normative Theory), ৩) কার্যকরী তত্ত্ব (Operational Theory) এবং ৪) প্রতিদিনের ব্যবহারিক তত্ত্ব (Every-day Theory)

১) সামাজিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব (Social Scientific Theory) ঃ

গণজ্ঞাপনের প্রকৃতি, কার্যধারা এবং সমাজের ওপর তার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনাই এই তত্ত্বের মূল বিষয়।

গণমাধ্যম কীভাবে গণজ্ঞাপনকে সার্থক করে তুলেছে সেটাই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে খতিয়ে দেখা হয়। স্বাভাবিকভাবেই গণমাধ্যমের কার্যধারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষার দ্বারা ভালোভাবে যাচাই করে নেওয়ার দরকার পড়ে। এ ছাড়া অন্যান্য সম্ভাব্য সূত্রকেও আশ্রয় করে গণমাধ্যমের গতিপ্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করা হয়।

গণমাধ্যমের পরিধি বিশাল। সামগ্রিকভাবে এই বিশাল কার্যধারাকে বিশ্লেষণ করে বোঝা, ব্যাখ্যা করা খুব সহজ কাজ নয়। সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিচার বিশ্লেষণকে সুসংগঠিতভাবে পরিচালিত করে সিদ্ধান্তে উপনীত হলেই তাত্ত্বিক রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে গণমাধ্যমের আকৃতিই শুধু বড় হচ্ছে না, প্রকৃতি ভীষণভাবে জটিল হয়ে উঠছে। শক্তিশালী আধুনিক গণমাধ্যমের কার্য ও তার সামাজিক প্রভাবও যথেষ্ট বৈচিত্রময় হয়ে ওঠার ফলে গবেষণালব্ধ তাত্ত্বিক ধারণাতেও আসে বৈচিত্র এবং তা স্বাভাবিকভাবেই বহুমাত্রিক হয়ে ওঠে।

সামাজিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ক্ষেত্র এখন আকারে বিশাল হয়ে উঠেছে। আবার বড় হয়ে ওঠার ফলে পুরো তাত্ত্বিক কাঠামোই সুগঠিত হয়ে ওঠে নি। বিভিন্ন মাত্রার গবেষণালব্ধ ধারণার মধ্যেও সবসময় সুসংগঠিত বজায় থাকে নি। আকারে বড় হওয়ার অন্যতম কারণ হল অনুসন্ধানের বিষয় বৈচিত্র্যের বিস্তৃতি। সমাজ সম্পর্কে অসংখ্য প্রশ্ন উঠে আসে। সমাজ ও গণমাধ্যম পরস্পর কীভাবে প্রভাবিত হচ্ছে তা জানতে গেলে নানাবিধ প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। এই সমস্ত প্রশ্নের উদ্দেশ্য থাকে সামগ্রিকতাকে অন্বেষণ করা। গণমাধ্যমেই প্রকৃতিই হোক অথবা প্রভাবই হোক, তা কীভাবে সমগ্র সামাজিক প্রেক্ষিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে সেটাই হয়ে দাঁড়ায় গবেষণার মূল বিষয়। কিন্তু এতো গেল মাত্র একটি খন্ডরূপের কথা। সমগ্রতাকে জানলেই কাজ শেষ হয় না। জানতে হয় সমাজপ্রেক্ষিত তৈরি করছে যাঁরা অর্থাৎ সেই সমস্ত ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে গণমাধ্যমের আন্তসম্পর্কের বিন্যাস। ব্যক্তি মানুষের আবরণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিবিধ বিষয়, যা ব্যক্তিগত স্তরে তথ্যের আদান-প্রদানকে প্রভাবিত করছে। এগুলিও সম্যকভাবে জানা দরকার। বস্তুনিষ্ঠ ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির আশ্রয়ে সমাজ থেকে ব্যক্তি মানুষ পর্যন্ত বিস্তৃত ক্ষেত্রের ওপর গবেষণা চালিয়ে তাত্ত্বিক ধারণা গড়ে তোলা এক বিপুল কর্মকান্ড হয়ে দাঁড়ায়। তত্ত্বের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে আকারে বিশাল।

এই তাত্ত্বিক ধারণাগুলির মধ্যে থাকে নানান ধরনের অনুসন্ধান। কোন তত্ত্ব কী ঘটছে তা ভালোভাবে বুঝতে চায়। সমাজ থেকে ব্যক্তি পর্যন্ত বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে কী ঘটে চলেছে সেটা জানাই জরুরী হয়ে ওঠে গবেষণায়। প্রকৃতির স্বরূপ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জানাটাই মুখ্য হয়ে ওঠে। আবার কোন তত্ত্বে সমালোচনামূকল দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রাখাই প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। পূর্বের কোন প্রতিষ্ঠিত ধারণাকে নতুন করে পর্যালোচনা করে একটি নতুন রূপ প্রতিষ্ঠা প্রচ্ছন্ন থাকে। তথ্য সরবরাহরে বাস্তব প্রয়োগ নিয়েও কোন তত্ত্বের অনুসন্ধন চালিত হয়। তথ্য সরবরাহের প্রক্রিয়া অনুসন্ধান করে বোঝার চেষ্টা হয় জনমানসে তার কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। মানুষ কতটা প্রভাবি হচ্ছে এই ব্যবস্থার দ্বারা সেটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এই তাত্ত্বিক আলোচনায়।

জ্ঞাপন তত্ত্বের আলোচনায় সামাজিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। গণমাধ্যম ও সমাজের আন্তঃসম্পর্ক ও পারস্পরিক প্রভাব বুঝতে এই তত্ত্ব যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গণমাধ্যমের বার্তা জনজীবনে কী প্রভাব ফেলছে সেটা সঠিকভাবে বোঝার জন্য সামাজিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিস্তৃত প্রেক্ষাপট খুবই জরুরী বলে বিবেচিত হয়।

২) **আদর্শনিষ্ঠ তত্ত্ব** (Normative Theory) ঃ

আদর্শগত দিক দিয়ে জ্ঞাপন বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনাই আদর্শনিষ্ঠ তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। মূল্যবোধভিত্তিক সামাজিক পরিমন্ডলের মধ্যে কীভাবে গণমাধ্যমের কাজ করা উচিত, সেটাই বিচার করা হয়

এই তত্ত্বে। পূর্বে নির্ধারিত কিছু সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা কথাই প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। সমাজে প্রচলিত সামাজিক দর্শন ও আদর্শকে ভিত্তি করেই এই তত্ত্বের রূপরেখা তৈরি হয়। উদারনীতিক গণতান্ত্রিক ভাবধারা অনুসরণ করে কিছু মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। আইনের চোখে সাম্য, আইনের অনুশাসন, মানুষের সমান অধিকার, শাসন ব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি বিষয় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদারনীতিক দর্শনের প্রভাবে গণমাধ্যমের কার্যধারাও গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। এই দর্শন থেকে উদ্ভুত সামাজিক মূল্যবোধের প্রভাব গোটা সমাজেই ব্যপ্ত থাকে। অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানও এই মূল্যবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে গণমাধ্যমের কার্যধারার ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। বণিকসভা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল চার গণমাধ্যম স্বাধীনভাবে তথ্য সরবরাহ করে ও মতামত দিয়ে শক্তিশালী জনমত গড়ে তুলবে। গণতান্ত্রিক ভাবধারার সম্প্রসারণে এবং গণতন্ত্রকে বাস্তবায়িত করতে এই জনমতের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। গণমাধ্যমের লক্ষ্য শ্রোতারাও চান গণমাধ্যম তাদের আশাআকাঙ্খাকে সার্থক করে তুলুক। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ধারণা এইভাবেই গড়ে উঠেছে। উদারনীতিক দর্শনের প্রবক্তারা সবসময়ই গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে অপরিহার্য শর্ত বলে গণ্য করেছেন। মুক্ত সমাজের জন্য প্রয়োজন হয়েছে স্বাধীন সংবাদপত্রের। আদর্শনিষ্ঠ তত্ত্বের প্রতিফলন পাওয়া যায় দেশের আইনকানুন, গণমাধ্যমনীতি, প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ ও নীতির মধ্যে। গণমাধ্যম ও সমাজের মধ্যে প্রতিনিয়ত যে আন্তঃসম্পর্ক ঘটে চলেছে সেগুলিকে মতাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করাই আদর্শনিষ্ঠ তত্ত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য। ঠিক যেভাবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে বিচার করা হয় প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রেক্ষিতে, অস্তিত্বের প্রশ্নও মতাদর্শ ও মূল্যবোধের প্রেক্ষাপটে বিচার করা হয়। এই আলোচনার মধ্যে কি ঘটছে এবং কীভাবে ঘটা উচিৎ। দুটোই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে খতিয়ে দেখা হয়।

উদারনীতিক গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রেক্ষাপটে সংবাদপত্রের ভূমিকা কী, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রকৃত অবস্থার পরিচয় জানার জন্য ১৯৪৭ সালে আমেরিকায় একটি কমিশন নিয়োগ করা হয়। কমিশনের সভাপতি ছিলেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য Robert Hutchins। কমিশন ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে স্বাধীন সংবাদপত্রের অস্তিত্বকে অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেছিল। একই সঙ্গে কমিশন সংবাদপত্রকে সামাজিক দায়িত্বহীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করে সাংবাদিকদের দায়িত্বশীল আবরণের রূপরেখা দিয়েছিল। Hutchins কমিশনের রিপোর্টই পরবর্তীকালে সামাজিক দায়িত্বশীলতার নীতি ও তার দার্শনিক ভিত্তিক রূপায়ণে উল্লেখজনক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়, গোটা পশ্চিম ইউরোপে সামাজিক দায়িত্বশীলতা আধুনিক গণতান্ত্রিক ভাবধারার সম্প্রসারণে খুবই উপযোগী ধারণা হিসেবে গণ্য হয়েছিল।

সমাজতান্ত্রিক দর্শনের গণমাধ্যম ভাবধারাও ব্যবস্থাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, কিউবা, ভিয়েৎনাম প্রভৃতি দেশে গণমাধ্যম কার্যধারাকে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুগঠিত করা হয়েছে। সংবাদপত্র, রেডিও এবং টেলিভিশন সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার আলোকে পরিচালিত হয়েছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রশ্নটিকেও দেখা হয়েছে একেবারে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষাই হয়ে দাঁড়িয়েছে গণমাধ্যমের মূল লক্ষ্য। শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলাই সেখানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মূল প্রেরণা।

১৯৯৭ সালে গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ Nordenstreng আদর্শনিষ্ঠ তত্ত্বের পাঁচটি রূপের উল্লেখ করেছেন। এই রূপগুলির মধ্যে বিভিন্ন মতবাদ ও ধারণার প্রভাব রয়েছে। প্রতিটি রূপই দেশ ও সমাজের প্রেক্ষাপটে বিশেষ মূল্যবোধ ও নীতিবোধকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। রূপগুলি হল এই রকম ঃ—

(ক) উদারনীতিক-বহুত্ববাদী রূপ ঃ—

সনাতন উদারনীতিক দর্শনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এই ধারণার রূপরেখা। ব্যক্তি মানুষের অধিকার রক্ষার ওপরই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। জনস্বার্থ রক্ষার বিষয়টিকে দেখা হয়েছে জনগণের

আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে। যে বিষয়ে জনগণের আগ্রহ আছে তাকেই জনস্বার্থ বলে মনে করা হয়। বাজার ব্যবস্থার ওপরই গণমাধ্যমগুলি নির্ভর করবে। সরকারি নিয়ন্ত্রণ যথাসম্ভব কম হবে এবং গণমাধ্যম স্ব-আরোপিত নিয়ন্ত্রণের দ্বারাই পরিচালিত হবে। এটাই এই উদারনীতিক বহুত্ববাদের মূলকথা।

(খ) সামাজিক দায়বদ্ধতার রূপ ঃ—

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সমাজের প্রতি এক বিশেষ দায়বদ্ধতা। সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিক মাধ্যম স্বাধীনভাবে তথ্য সরবরাহের সময় অবশ্যই স্মরণ রাখবে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার কথা। শুধুমাত্র গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের লাভ-ক্ষতির কথা ভাবলেই চলবে না, ব্যাপক অর্থে সামাজিক লাভ ক্ষতির কথাও ভাবতে হবে। ব্যক্তিত্ববাদী রাজনৈতিক দর্শনের চেয়ে সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীজীবন-ভাবনাই বেশি গুরুত্ব পায় এই দায়বদ্ধতাকেন্দ্রিক তাত্ত্বিক রূপরেখায়।

(গ) সমালোচনামূলক রূপ ঃ—

বিভিন্ন সামাজিক কাঠামোর বিন্যাসের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষা করে গণমাধ্যম। সমাজের মধ্যে রয়েছে নানান স্তর, প্রতিনিয়ত এই স্তরগুলির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করছে গণমাধ্যম। সবসময় এই যোগাযোগের মধ্যে থেকে সদর্থক ফল পাওয়া যায় না। অনেক সময় অসঙ্গতি ও সংঘাতও তৈরি হয়। সরকারের সঙ্গে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের বিরোধ দেখা দিতে পারে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে এরকম বিরোধ বহুবার বিভিন্ন দেশে তৈরি হয়েছে। সরকারের তৈরি করা কোন আইন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করছে বলে মনে করতে পারে সংবাদপত্র। একইভাবে গণমাধ্যমের কার্যধারা সঠিকপথে চালিত হচ্ছে না বলে মনে করতে পারে বিভিন্ন প্রভাবশালী সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সরকার। এই তাত্ত্বিক আলোচনায় সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিই প্রাধান্য পায়।

(ঘ) প্রশাসনিক রূপ ঃ—

ঊনিশ শতকের এলিট বুর্জোয়া প্রেসের ধ্যানধারণার মধ্যে এর উৎস নিহিত। সরকার পরিচালনায় যুক্ত আমলাদের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গিই সংবাদের প্রধান উৎস বলে বিবেচিত হয়। বস্তু নিষ্ঠার নীতিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হলেও কার্যত, প্রশাসনিক সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যকেই বিশ্বস্ত সূত্র বলে মনে করা হয়। রাজনৈতিক নেতৃবর্গ ও পরিচালন কাজে নিযুক্ত আমলাদের স্বার্থ রক্ষা করাই গণমাধ্যমের আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ মানুষের স্বার্থ সেভাবে রক্ষিত হয় না।

(ঙ) সাংস্কৃতিক সম্পর্কের রূপ ঃ—

সনাতন গণমাধ্যমের যে ধারা সমাজে প্রচলিত তা মূলত আঞ্চলিক সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করে। একটি দেশ ও সমাজের মধ্যে এরকম বহু ধারা রয়েছে। এক একটি অঞ্চলের মধ্যে এই ধারা সীমাবদ্ধ থাকে। কোন সর্বজনীন যুক্তিবাদী ধারণা দিয়ে এই রূপকে বোঝা যাবে না। গ্রামাঞ্চলে যে গোষ্ঠী জীবনধারা বয়ে চলেছে তা যেমন বৈচিত্রময়, তেমনি ঐশ্বর্যময়। কিন্তু কোন ভাবেই তা সর্বজনীন সূত্র দিয়ে বোঝা যাবে না। এক একটি অঞ্চলের মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয় এই সাংস্কৃতিক রূপের মধ্যে। গোষ্ঠীর জীবনের সুসংহতি প্রতিষ্ঠা করাই উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়।

৩) কার্যকরী তত্ত্ব (Operational Theory) ঃ

গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের কার্যধারাকে কেন্দ্র করে কার্যকরী তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। প্রতিদিন কাজ করতে গিয়ে সাংবাদিকরা এবং অন্যান্য কর্মীরা যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছেন তাই নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হয়

এই তত্ত্বে। পেশাদারী অভিজ্ঞতা ও প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিন্যাসের মধ্যেই গবেষণার ক্ষেত্র বিস্তৃত রয়েছে। পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণের মধ্য দিয়ে অনুধাবন করা যায় প্রয়োগ সম্পর্কিত কার্যধারার প্রকৃতি এবং তা গণমাধ্যমের ভূমিকা পর্যালোচনা করতে বিপুলভাবে সাহায্য করে। গণমাধ্যম কীভাবে সংবাদ ও অন্যান্য বিষয় নির্বাচন করছে তা জানা যাবে এই কার্যকরী তত্ত্বের আলোচনায়। লক্ষ শ্রোতার আকাঙ্খা ও চাহিদা কতটা পূরণ হচ্ছে তাও সঠিকভাবে অনুধাবন করা যাবে। বিজ্ঞাপণের বার্তা ও বিন্যাস তৈরিতে সামাজিক প্রেক্ষিতের ভূমিকা কী এবং তা বিজ্ঞাপন তৈরির প্রক্রিয়াকে কতটা প্রভাবিত করে সেটাও জানা যাবে কার্যকরী তত্ত্বের আলোচনায়।

সংবাদপত্রে, রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচুর সংবাদ এসে জড়ো হয়। সংবাদ-সংস্থা যে খবর পাঠায় তার পরিমাণই বিশাল। এই বিপুল সংবাদপ্রবাহ থেকে সামান্য অংশই নির্বাচন করা হয় পরিবেশনের জন্য। সংবাদপত্রের পাঠক সংবাদপত্রের যেটুকু পায় তা হল ঐ নির্বাচিত সংবাদের প্রবাহ। সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক, বার্তা সম্পাদকের মতো দায়িত্বশীল পরিচালকরা এই নির্বাচনের কাজটা করেন। গবেষকরা দেখেছেন এই নির্বাচন প্রক্রিয়া বিভিন্ন বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয়। সংবাদপত্রের নীতি, বাজারের প্রভাব, পাঠকের রুচি-পছন্দ, বিজ্ঞাপনদাতার প্রভাব বিবিধ বিষয় জড়িয়ে আছে এই নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে। প্রক্রিয়াটিকে বলা হচ্ছে গেট কীপিং এর কাজ। একজন গেটকীপার যেমন বিচারবিবেচনা করে ঠিক করে কে প্রবেশ করবে, কে করবে না, সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালকরা সংবাদ নির্বাচন ঠিক এভাবেই করে থাকেন। রেডিও, টেলিভিশনের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। এই গেটকীপিং-এর বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে গেলে এই কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের আচরণ পরীক্ষা করে দেখা দরকার। কার্যকরী তত্ত্বে এই আচরণগত পর্যালোচনা খুবই প্রয়োজনীয় ও জরুরী। এই আলোচনায় নীতিগত বিষয়ও অনিবার্যভাবে এসে পড়বে। কারণ কীভাবে কাজ করলে সাংবাদিকদের সামাজিক দায়বদ্ধতা বজায় থাকবে অথবা থাকবে না তার সঙ্গে নীতিবোধের যোগ খুবই গভীর। নীতি সম্পর্কিত আলোচনার সঙ্গে আবার আদর্শনিষ্ঠ তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

পেশাদারী উৎকর্ষের দাবি যত বেশি জোরদার হচ্ছে, কার্যকরী তত্ত্বের গুরুত্ব তত বাড়ছে। কর্মচারীদের মানসিকতা, উৎকর্ষতা তৈরিতে সামাজিক পরিমন্ডলও খুব উল্লেখজনক ভূমিকা পালন করে। সাংবাদিকদের আচরণকে বুঝতে গেলে যে পরিবেশে তাঁরা কাজ করছেন, যে বিষয় থেকে তাঁরা কাজের অনুপ্রেরণা পাচ্ছেন তা বিচার বিবেচনা করতে হয়। আচরণ তৈরি হয় সমাজপরিমন্ডল থেকেই।

৪) প্রতিদিনের ব্যবহারিক তত্ত্ব (Everyday Theory) ঃ

এই তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল গণমাধ্যমের ব্যবহার। প্রতিদিন মানুষ নিজের প্রয়োজন মেটাতে গণমাধ্যমের ব্যবহার করে। কাগজ পড়ে, সাময়িকপত্র হাতে তুলে নেয়, রেডিও শোনে, টিভি দেখে। দৈনন্দিন জীবনে এইভাবেই গণমাধ্যম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। সমাজ পরিস্থিতিকে ভালোভাবে বোঝার জন্য, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটাতে গণমাধ্যম ছাড়া মানুষ এক পাও চলতে পারে না। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে গণমাধ্যমকে ব্যবহার করতে হচ্ছে।

গণমাধ্যমের এই ব্যাপক ব্যবহার থেকেই প্রতিদিনের ব্যবহারিক তত্ত্বের রূপরেখা তৈরি হয়েছে। গণমাধ্যম ব্যবহারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক জরুরী বিষয়। মাধ্যম ব্যবহারের বিষয়টিকে বুঝতে এই বিষয়গুলির আলোচনা দরকার। ব্যবহারের আগে অনিবার্যভাবে যে বিষয়টি বড় হয়ে দেখা দেয় তাহল কোন মাধ্যম ব্যবহার করবে। সংবাদপত্র, বেতার অথবা টেলিভিশন। যে কোন একটি মাধ্যম বেছে নেওয়া হয় ব্যবহারের জন্য। কোনটি বেছে নেওয়া হবে একটি বিশেষ সময়ে তা ব্যবহারকারী ঠিক করেন নিরন্তর প্রয়োজন অনুসারে। যদি কেউ ঠিক করেন সংবাদপত্র পড়বেন তাহলে তাঁকে আবার বেছে নিতে হয় বহু সংবাদপত্রের মধ্যে একটি। বাজারে

বহু সংবাদপত্র রয়েছে। কোনটি তাঁর প্রয়োজন মেটাবে তা নিয়েও যথেষ্ট ভাবনা চিন্তার অবকাশ রয়েছে। আবার যদি মাধ্যম হয় টেলিভিশন, তাহলেও ঠিক করতে হয় কোন চ্যানেলের অনুষ্ঠান দেখা হবে। মাধ্যম ব্যবহারের সঙ্গে ব্যবহারকারীর পছন্দের গভীর যোগ রয়েছে। এই পছন্দের কোন নির্দিষ্ট রূপ নেই। সময় ও ক্ষেত্র বিশেষে তা সবসময়ই পরিবর্তনশীল। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে পছন্দ যেভাবে কাজ করবে, টেলিভিশনের ক্ষেত্রে তা অন্যরকম হতে পারে। আবার এক দিন থেকে অন্য দিনে এই পছন্দ পাল্টাতে পারে। এই পছন্দ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর মনস্তত্ত্ব, রুচিবোধ, চাহিদা ও প্রয়োজনবোধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। মানুষে মানুষে রুচিবোধ, চাহিদা আলাদা। স্বাভাবিকভাবেই মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রেই তারতম্য ঘটে এই স্বাতন্ত্রের জন্য। মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থানও পছন্দ নিবারণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং উচ্চমধ্যবিত্তের পছন্দ এরকম হয় না। শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অবস্থান এই পছন্দ ঠিক করে দেয়।

গণমাধ্যম কী বার্তা পরিবেশন করবে এবং তার প্রভাব জনমানসে কী হবে তা বহুলাংশে নির্ভর করে ব্যবহারকারীদের রুচি ও পছন্দের ওপরে। গণমাধ্যম যে বার্তা নিয়ে আসে তা কীভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে সেটা খতিয়ে দেখা দরকার। সংবাদপত্রের একটি লেখার মধ্যে কী তাৎপর্য লুকিয়ে আছে সেটা বুঝবে পাঠক। কিন্তু এই বোঝার ক্ষেত্রে পাঠকের শিক্ষা ও রুচিবোধের ভূমিকা রয়েছে। বিজ্ঞাপনের বার্তা অনুধাবনের ক্ষেত্রেও দর্শকের মানসিকতা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। বিজ্ঞাপন দেখে সবাই একইভাবে প্রভাবিত হয় না। একেক জনের কাছে বিজ্ঞাপনের বার্তা একেক রকম প্রভাব ফেলে।

ব্যবহারকারীদের কাছে আগে থাকতেই মাধ্যম সম্পর্কে যে পূর্ব ধারণা আছে তার প্রভাব রয়েছে মাধ্যম নির্বাচনের ক্ষেত্রে। মানুষের মানসিকতার মধ্যেই মাধ্যম সম্পর্কিত এই ধারণা রয়েছে। যে মাধ্যম বেশি বিশ্বাসযোগ্য সেই মাধ্যমই বেছে নেবে ব্যবহারকারী। এই বিশ্বাসযোগ্যতার পটভূমি আগে থাকতেই তৈরি থাকে। মাধ্যমের কার্যধারা অনুধাবন করেই ব্যবহারকারী ঠিক করেন কোন মাধ্যমটি ব্যবহার করবেন। প্রতিদিনের মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের কার্যধারাও সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

৩.৫ সংবাদপত্রের চারটি তত্ত্ব

সমাজে সংবাদপত্র ভূমিকাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়। গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা সংবাদপত্র ও সমাজের মধ্যে যে আন্তসম্পর্ক রয়েছে তা অনুসরণ করে চারটি তাত্ত্বিক রূপরেখা দিয়েছেন। গণমাধ্যম-এর তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গেলে এই চারটি তত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা থাকলে সুবিধা। দর্শন ও সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই তত্ত্বগুলি গড়ে উঠেছে। এই তত্ত্বগুলি হল — (১) কর্তৃত্ববাদী তত্ত্ব (Authoritarian theory) (২) উদারনীতিক তত্ত্ব (Liberatarian theory) (৩) সাম্যবাদী তত্ত্ব (Communist theory) (৪) সামাজিক দায়বদ্ধতার তত্ত্ব (Social responsibility theory)।

কর্তৃত্ববাদী তত্ত্ব ঃ—

সংবাদপত্র কীভাবে কাজ করবে তা অনেকাংশে নির্ভর করে দেশে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপরে। শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে রাজনৈতিক দর্শনের ওপরে ভিত্তি করে। ইউরোপের বহু দেশেই একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কর্তৃত্ববাদী দর্শনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। কর্তৃত্ববাদীরা মনে করতেন দেশের ভালোমন্দ একজন একনায়কের হাতে ন্যস্ত থাকবে। এই ন্যস্ত কর্তৃত্বই এগিয়ে নিয়ে যাবে দেশকে। কোনরকমে বিরোধিতা ও সমালোচনার জায়গা থাকবে না। সংবাদপত্রকেও এই কর্তৃত্ব মেনে চলতে হবে। জার্মানি, ইটালিতে এই কর্তৃত্ববাদী

ধারণার বিকাশ হয়েছিল হিটলার ও মুসোলিনির আমলে। স্পেনের ফ্রাংকোর রাজত্বও ছিল কর্তৃত্ববাদী ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সংবাদপত্রের কোন স্বাধীনতা এই ব্যবস্থায় থাকে না। শাসন ব্যবস্থায় একনায়কের কর্তৃত্বকে সমর্থন করাই একমাত্র কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় সংবাদপত্রের।

উদারনীতিক তত্ত্ব ঃ—

স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য চিরন্তন সংগ্রামের কথা ধ্বনিত হয় উদারনীতিক তত্ত্বে। সংবাদপত্র স্বাধীনভাবে কাজ করবে এবং যে কোন মতামত ব্যক্ত করতে পারবে। সমাজবিকাশে উদারনীতিক দর্শনের প্রভাব সংবাদপত্র পর্যন্ত বিস্তৃত। উদারনীতিক দর্শন কোনরকম নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতিকেই আদর্শ অবস্থা বলে মনে করে। মানুষ স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করবে এবং সেই মতো আচরণ করবে এটাই উদারনীতিক দর্শনের মূল কথা। সংবাদপত্রর কার্যকারিতা এই দার্শনিকভিত্তির ওপর নির্ভর করে। সংবাদপত্র হবে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণমুক্ত। সংবাদপত্রের কাজে কোনরকম সরকার হস্তপেক্ষ থাকবে না। কীভাবে কাজ করা উচিৎ তা সংবাদপত্র নিজেই ঠিক করে, আত্ম-সঠিকতার নীতি অনুসরণ করে। এই তত্ত্বের মূল ভিত্তি হল সত্যই সবসময় জয়লাভ করে এই বিশ্বাস। বহু মাত্রিক বিশ্বাস ও মতবাদের মধ্য থেকে সঠিক সত্যপথের সন্ধান পাওয়া যাবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এই উদারনীতিক তত্ত্বের দ্বারা গণমাধ্যম দীর্ঘদিন ধরে পরিচালিত হয়েছে। স্বাধীন চিন্তা ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে উদারনীতিক তত্ত্বের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। এই তত্ত্ব অনুসারে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের মালিকদের স্বার্থই বেশি সুরক্ষিত হয়েছে। বাজারমুখী যে কোন প্রতিষ্ঠানিক কার্যকলাপের সমর্থন আছে এই নীতিতে। মুক্তচিন্তার বিকাশে সরকারি নিয়ন্ত্রণ বাধা সৃষ্টি করে এই ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বেসরকারি উদ্যোগের নেতিবাচক আচরণের প্রতি কোন গুরুত্বই দেওয়া হয় নি। মুনাফার লোভে বেসরকারি গণমাধ্যমও কিন্তু দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়ে মুক্ত চিন্তার বিকাশে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে।

সাম্যবাদী তত্ত্ব ঃ—

সাম্যবাদী ভাবধারার আলোকে এই গণমাধ্যম তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। মার্কসবাদী দর্শনই হল এই তত্ত্বের প্রধান অনুপ্রেরণা। শ্রেণীহীন সমাজে রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকবে না। শোষণহীন সমাজের সর্বক্ষেত্রে সাম্য হবে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই লক্ষ্যে যাবার পথে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হবে এবং ঐ রাষ্ট্র সামাজিক উপকরণের মালিকানা থাকবে রাষ্ট্রের হাতে। ব্যক্তিগত মালিকানার অস্তিত্ব থাকবে না। উদারনীতিক তত্ত্বের একেবারে বিপরীত ধারণার অনুসারী সাম্যবাদী তত্ত্বে ব্যক্তির অধিকারের চেয়ে সমাজের অধিকারের ওপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গণমাধ্যমের কার্যধারাও এই সমষ্টিগত সামাজিক স্বার্থ রক্ষা করার দিকেই চালিত হয়। মুনাফা নয়। সামাজিক সুষম বন্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করে গণমাধ্যম। মার্ক্সিয় ভাবধারা অনুযায়ী অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশন কাজ করে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অর্থ হয়ে দাঁড়ায় মার্ক্সবাদী ভাবধারার প্রেক্ষায় সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশনের যে স্বাধীনতা থাকে উদারনীতিকে গণতান্ত্রিক দেশে, তা সাম্যবাদী তত্ত্বে স্বীকার করা হয় না। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনে এই সাম্যবাদী গণমাধ্যম তত্ত্বের প্রয়োগ করা হয়েছিল। সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশনের মালিকানা ঐ সমস্ত দেশে বেসরকারি হাতে ছিল না। সরকার, পার্টি অথবা ট্রেড ইউনিয়নের উদ্যোগে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হত।

সামাজিক দায়বদ্ধতার তত্ত্ব ঃ—

উদারনীতিক তত্ত্বের সীমাবদ্ধতাকে সংশোধন করে বিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক দায়বদ্ধতার ধারণা জোরদার হয়ে ওঠে। সংবাদপত্র শুধুমাত্র সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করবে এবং তাতেই সামাজিক মঙ্গল সাধিত হবে এ ধারণা ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসে। সামাজিক স্বার্থে সংবাদপত্রকেও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। শুধুমাত্র নিজের অস্তিত্বটুকুর কথা ভাবলে চলবে না। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতাও বজায় রাখতে হবে। ব্যক্তি মালিকানার অধীনে সংবাদপত্র যদি শুধু নিজের মুনাফার কথা ভাবে তাতে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটলেও, সাংবাদিকতার গুণগত মান উন্নত হয় না। সাংবাদিকতার নীতি, উদ্দেশ্য যদি বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থের কথা বিবেচনা করে তৈরি হয় তাহলেই সামাজিক দায়বদ্ধতা বাস্তবায়িত হতে পারে। দায়বদ্ধতার এই ধারণা থেকেই উদ্ভব হয়েছে সামাজিক দায়বদ্ধতার তত্ত্ব।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যে ব্যঞ্জনা পায় উদারনীতিক তত্ত্বে তার মধ্যে রয়েছে নেতিবাচক ধারণা। সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পাওয়ার অর্থ হল সংবাদপত্রের কোন কাজে সরকারি হস্তক্ষেপ থাকবে না। যেমন খুশী সংবাদপত্র নিজের পথে চলবে। মুনাফা অথবা অন্য কোন কায়েমি স্বার্থ-সাধন করতে গিয়ে সংবাদপত্র যদি সামাজিক স্বার্থকে উপেক্ষা করে তাহলেও তা মেনে নিতে হবে, কারণ সংবাদপত্র স্বাধীন। সামাজিক দায়বদ্ধতার সমর্থকরা এই অবস্থা মেনে নেননি। তাঁরা বিকল্প অবস্থার সন্ধান দিতে গিয়ে সামাজিক হস্তক্ষেপ এবং স্বেচ্ছা আরোপিত নীতির কথা বলেছেন। তাঁদের মূল কথা সংবাদপত্র হবে সামাজিক দায়বদ্ধ এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে হতে হবে পরস্পরের পরিপূরক। স্বাধীনতা ভোগ করার সময় সাংবাদিকতা সমাজের প্রতি সমানভাবে দায়িত্বশীল থাকতে হবে। এই দায়িত্বশীলতা বজায় রাখার জন্য পেশাদারী বিভিন্ন সংগঠন নির্দেশিকা জারি করতে পারে। এই নির্দেশিকা হল সামাজিক হস্তক্ষেপ। সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে সঠিকপথে চালাতে এই হস্তক্ষেপ সাহায্য করে।

উন্নয়ন তত্ত্ব ঃ—

চারটি তত্ত্বের রূপরেখা সমাজের প্রয়োজন ও চাহিদা পুরোপুরি মেটাতে পারে না। বিশেষ করে দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক চাহিদার যখন তারতম্য ঘটে তখন এই তত্ত্বগুলির সীমাবদ্ধতা প্রকট হয়ে ওঠে। যেমন ভারতীয় সমাজে উদারনীতিক তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা একেবারেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই সব সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষিতেই কয়েকজন গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ নতুন একটি তত্ত্বের রূপরেখা দিয়েছেন। এর নাম উন্নয়ন তত্ত্ব। যে সমস্ত দেশ দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিল এবং গত শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে স্বাধীনতা অর্জন করতে শুরু করে তাদের চাহিদা ও প্রয়োজন ছিল একেবারে অন্যরকম। উন্নতদেশগুলির চাহিদা ও প্রয়োজন দিয়ে তাদের অবস্থা একেবারেই বোঝা যাবে না। এই সমস্ত দেশগুলির কাছে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। উন্নয়নশীল এই দেশগুলির কাছে পর্যাপ্ত মূলধন না থাকায় পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল। McQuail, Altschull এবং Hatchten বলেছেন এই অগ্রগতির পথে ঐ সমস্ত উন্নয়নশীল দেশের গণমাধ্যমগুলি সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। গণমাধ্যমের কার্যক্রম উন্নয়নকে তরান্বিত করার লক্ষ্যে পরিচালিত হবে। প্রয়োজনে সরকার সাংবাদিকদের স্বাধীনতাতেও হস্তক্ষেপ করতে পারবে। গণমাধ্যমের, অধিকার ও স্বাধীনতার চেয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার। দেশের সাধারণ মানুষকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহ দিতে এবং উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার নির্বাচন করতে সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশন সর্বদাই সচেষ্ট থাকবে। এই উন্নয়ন তত্ত্ব থেকেই উদ্ভব হয়েছে উন্নয়মুখী সাংবাদিকতার।

৩.৬ গণমাধ্যম ও জনমত

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনমত গঠনে গণমাধ্যমের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। স্বাধীন সংবাদপত্র, বেতার

ও টেলিভিশন সংবাদ পরিবেশন ও মতামত প্রকাশ করে সাধারণ মানুষের মতামতকে প্রভাবিত করে। বিশেষ করে গণমাধ্যমের নিজস্ব সম্পাদকীয় মন্তব্য মতামত গঠনের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নিবন্ধ সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর যে বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনার অবতারণা করে তা পাঠকের চিন্তাভাবনার ওপর ছাপ ফেলে। যুক্তিতর্ক দিয়ে সম্পাদকের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় এই সম্পাদকীয় নিবন্ধে। জটিল রাজনৈতিক বিষয়। আর্থ-সামাজিক বিষয় নিয়ে যে মতামত ও বক্তব্য রাখা হয় তা পাঠকদের মতামতকে প্রভাবিত করে। কখনও সরকারি নীতির বিরুদ্ধে আবার কখনও রাজনৈতিক দলের বিশেষ কার্যক্রমের পক্ষে। কোন সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আলোকপাত করে এমন কিছু বিষয়ের ওপর যা মানুষকে বিষয়টি নিয়ে নতুন করে ভাবায়, সংবাদপত্রের দেওয়া মন্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করতে উৎসাহিত করে। সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় বিশেষ নিবন্ধ ছাপা হয়। ঐ সমস্ত লেখায় সুস্পষ্ট মতামত থাকে। জনমত গঠনে এই সমস্ত রচনারও যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

টেলিভিশনে আজকাল বহু বিষয়ের ওপর চর্চা করা হয়। রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক বহু সমস্যা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। দর্শকরা ঐ অনুষ্ঠান দেখে, যুক্তিতর্ক শুনে প্রভাবিত হয়। এইভাবে টেলিভিশন জনমত গঠন করে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গুজরাত দাঙ্গার সময় ভারতের কয়েকটি উপগ্রহ চ্যানেল তাদের কভারেজ ও অনুষ্ঠান পরিবেশনার দ্বারা জনমতকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। সমাজে গণমাধ্যমের প্রভাব যত বাড়ছে জনমত গঠনে গণমাধ্যমের গুরুত্ব তত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩.৭ বাণিজ্য ও বিপণনে গণমাধ্যম

আধুনিক অর্থ ব্যবস্থায় গণমাধ্যমের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশন অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিষয়ে প্রচুর খবরাখবর দিচ্ছে। এই খবরাখবরের গুরুত্ব এত বেশি যে অর্থনীতি বিষয়ের জন্যই আলাদা কাগজ প্রকাশিত হয়। ইকনমিক টাইমস, ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস সম্পূর্ণভাবে অর্থনীতি বিষয়ের কাগজ। টেলিভিশনে বিভিন্ন উপগ্রহ চ্যানেল প্রচুর অর্থনীতি ও বাণিজ্যের খবর দেয়। সি.এন.বি.সি. নামে একটি উপগ্রহ চ্যানেলই আছে এই বিষয়ে খবরাখবর ও অনুষ্ঠান দেখানোর জন্য। বাজার অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক খবরাখবরের প্রচুর গুরুত্ব রয়েছে। শেয়ার বাজার পুরোপুরি নির্ভর করে এই খবরাখবরের ওপরে। যারা শেয়ার কিনবে ও বিক্রি করবে তারা তাদের সিদ্ধান্ত নেয় খবরাখবর দেখেই। প্রতি মুহূর্তে বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ারের দর জানা দরকার, কোম্পানিগুলো কীভাবে চলছে সেটা জানাও জরুরী।

গণমাধ্যম বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভরশীল। আবার বিজ্ঞাপনও গণমাধ্যমকে তার প্রধান মাধ্যম করে। অধিকাংশ বিজ্ঞাপন আমরা দেখি সংবাদপত্রে, সাময়িকপত্রে, বেতারে এবং টেলিভিশনে। সাধারণ মানুষকে জানানো এবং বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একটি দ্রব্য বা পরিষেবা কেনার জন্য মানুষকে প্রণোদিত করাই হল বিজ্ঞাপনের কাজ। এই কাজটি সম্পন্ন হয় জ্ঞাপনের মাধ্যমে। জ্ঞাপন করতে গেলেই মাধ্যম দরকার। বহু মানুষের কাছে অল্প সময়ের মধ্যে জ্ঞাপন করতে হলে সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, বেতার ও টেলিভিশনই উপযুক্ত গণমাধ্যম। বিজ্ঞাপনদাতা প্রয়োজন বুঝে মাধ্যম নির্বাচন করে। গণমাধ্যমের অস্তিত্বও তাই বিজ্ঞাপনের ওপর অনেকখানি নির্ভর করে। সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রচুর আয় করে বিজ্ঞাপন থেকে। যে কাগজ ও সাময়িকপত্র যত বেশি বিজ্ঞাপন পায় তার আর্থিক অবস্থা তত ভালো। কম দামে পাঠকের হাতে পত্রিকা তুলে দেওয়া সম্ভব হয় বিজ্ঞাপন থেকে প্রচুর আয় হওয়ার জন্যই। সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের উৎপাদন খরচের বিপুল অংশই উঠে আসে বিজ্ঞাপন থেকে। টেলিভিশনেও প্রচুর বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। প্রতিদিন আকর্ষণীয় যে সমস্ত অনুষ্ঠান দেখি তার স্পনসররা হল বিজ্ঞাপনদাতা।

বিজ্ঞাপন বিপণনে সাহায্য করে। বিভিন্ন কোম্পানি বাজার তৈরি করতে বিজ্ঞাপনরে আশ্রয় নেয়। খবরের কাগজে, টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন দিয়ে তারা ক্রেতা তৈরি করতে চায়। ক্রেতা তৈরি হলেই বাজার সৃষ্টি হবে। প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বাজার দখল করার লড়াই নিরন্তর চলে। আর এই লড়াইয়ে বিজ্ঞাপন অন্যতম সহায় হয়ে দাঁড়ায়। বিজ্ঞাপন মানেই গণমাধ্যমের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। যে কোম্পানি যত বেশি গণমাধ্যমের ব্যবহার করবে তার বাজার দখলের সম্ভাবনা তত বেশি হয়। আধুনিক বিপণন ব্যবস্থায় গণমাধ্যমের ব্যবহার প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে।

জনসংযোগসংক্রান্ত কাজকর্মেও গণমাধ্যমের ব্যবহার রয়েছে। কোনও তথ্য বা আইডিয়ার পক্ষে প্রচার চালাতে গণমাধ্যমের প্রয়োজন আছে। লক্ষ্য শ্রোতার কাছে কোন বিশেষ বার্তা বয়ে নিয়ে যাবার জন্যও গণমাধ্যমের দরকার হয়। জনসংযোগ আধিকারিককে সফল গণমাধ্যমের সঙ্গেই সুসম্পর্ক রেখে চলতে হয়। গণমাধ্যম যাতে সবসময় তাঁর প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ভালো খবরাখবর দেয় সেটা নিশ্চিত করাই জনসংযোগ আধিকারিকের অন্যতম কাজ। প্রতি মুহূর্তেই তাই জনসংযোগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে গণমাধ্যম।

৩.৮ সারাংশ

গণমাধ্যমের কার্যধারাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে গণমাধ্যমতত্ত্ব। সমাজে গণমাধ্যম যত জনপ্রিয় হয়েছে, গণমাধ্যমের সামাজিক প্রভাবও তত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজ বিজ্ঞানের আলোচনায় গণমাধ্যম হয়ে উঠেছে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়। সমাজের সঙ্গে গণমাধ্যমের সম্পর্ক কী এবং এই সম্পর্কের বিন্যাসের মধ্যে কেন বিষয়গুলি জড়িয়ে আছে তা ভালোভাবে জানার জন্য গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন তাত্ত্বিক রূপরেখা দিয়েছেন। গবেষণার মধ্য থেকে উঠে এসেছে নতুন নতুন প্যারাডাইম বা তত্ত্ব।

গণমাধ্যম তত্ত্বের প্রধান চারটি ধারার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তার স্বাধীন সত্তা নিয়ে টিকে থাকা। দ্বিতীয়টি হল স্বৈরতন্ত্রের বিরোধীতা করা। তৃতীয়টি দার্শনিক ভাবধারার দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ওপর গুরুত্ব দেয়। চতুর্থত, গণমাধ্যম এক নতুন সমাজ ভাবনা রূপরেখা তৈরি করে, যার নাম গণসমাজ। এই সমাজে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ কমে আসে। সমাজে থেকেও মানুষ এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা বোধে আচ্ছন্ন থাকে এবং বর্হিবিশ্বের সম্পর্কের জন্য সম্পূর্ণভাবে গণমাধ্যমের ওপর নির্ভর করে। কী এলিট, কী সাধারণ মানুষ, সমস্ত মানুষের কাছেই গণমাধ্যম নিজের উপযোগিতা প্রতিষ্ঠা করে।

গণমাধ্যমের নিজস্ব মতাদর্শ রয়েছে। এই মতাদর্শ গণমাধ্যমের কাজে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। গণমাধ্যমের মালিকানাও এপ্রসঙ্গে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। কারণ গণমাধ্যমের মতাদর্শ নিয়ন্ত্রিত করে গণমাধ্যমের মালিক গোষ্ঠী।

গণজ্ঞাপন বাস্তবায়িত হয় গণমাধ্যমের দ্বারা। গণমাধ্যম কার্যধারা এবং তার সামাজিক প্রভাবকে ভালোভাবে বোঝার জন্য গণমাধ্যম তত্ত্বের আলোচনা খুবই জরুরি হয়ে ওঠে। গণজ্ঞাপন চর্চায় গণমাধ্যম তত্ত্বের প্যারাডাইম গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

গণমাধ্যম তত্ত্বের চারটি রূপ রয়েছে। এগুলি হল (১) সামাজিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, (২) আদর্শনিষ্ঠ তত্ত্ব, (৩) কার্যকরী তত্ত্ব, (৪) প্রতিদিনের ব্যবহারিক তত্ত্ব। এই তত্ত্বগুলি গণমাধ্যমের দার্শনিক ভিত্তি ও কার্যধারাকে সামাজিক প্রেক্ষায় আলোচনা করে।

গণমাধ্যমের মধ্যে সংবাদপত্র হল একটি শক্তিশালী মাধ্যম। সংবাদপত্র ও সমাজের আন্তঃসম্পর্কের বিন্যাসকে কেন্দ্র করে চারটি তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। এগুলি হয় (১) কর্তৃত্ববাদী তত্ত্ব, (২) উদারনীতিক তত্ত্ব, (৩) সাম্যবাদী

তত্ত্ব, (৪) সামাজিক দায়বদ্ধতার তত্ত্ব, (৫) সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শন এই তত্ত্বগুলি নির্মাণে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে।

জনমত গঠনে গণমাধ্যমের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সংবাদপত্র, বেতার এবং টেলিভিশন সংবাদ, সম্পাদকীয় এবং পর্যালোচনাকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান প্রচার করে জনমতকে প্রভাবিত করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণমাধ্যমের জনমত গঠনের ভূমিকা বর্তমানে খুবই গুরুত্ব পাচ্ছে।

বাণিজ্য ও বিপণনে গণমাধ্যমের ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে। আধুনিক অর্থব্যবস্থায় বাণিজ্য বিষয়ক খবরাখবরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। শেয়ারবাজারের বেচাকেনা নির্ভর করে আছে বাণিজ্য বিষয়ক খবরাখবরের ওপর। বিজ্ঞাপন দিতে সবসময় গণমাধ্যম লাগে। সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশনে প্রচুর বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। বিজ্ঞাপন যত বাড়ছে গণমাধ্যমের প্রাসঙ্গিকতাও তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসংযোগের কাজেও গণমাধ্যমের গরুত্ব রয়েছে। জনসংযোগ রক্ষায় সর্বদাই গণমাধ্যমের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হয়।

৩.৯ অনুশীলনী

১) গণমাধ্যম তত্ত্ব বলতে কী বোঝেন? সংক্ষেপে লিখুন।

২) গণসমাজের ধারণায় গণমাধ্যমের ভূমিকা কী?

৩) গণজ্ঞাপন ও গণমাধ্যমের সম্পর্ক কী?

৪) গণমাধ্যম তত্ত্বের চারটি রূপ কী? সংক্ষেপে লিখুন।

৫) কার্যকরী তত্ত্ব সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

৬) প্রতিদিনের ব্যবহারিক তত্ত্ব কী? সংক্ষেপে লিখুন।

৭) সংবাদপত্রের চারটি তত্ত্ব কী? সংক্ষেপ বর্ণনা করুন।

৮) জনমত গঠনে সংবাদপত্রের ভূমিকা কী?

৯) বিজ্ঞাপন ও বিপণনে গণমাধ্যমের ব্যবহার সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

১০) আর্থিক ব্যবস্থায় গণমাধ্যমের ভূমিকা কী?

৩.১০ গ্রন্থপঞ্জী

গণজ্ঞাপন — ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়

জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম — ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

ভারতীয় গণমাধ্যম — বংশী মান্না

Mass Communication Theory — Denis McQuail

গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী — এম.এল.ডি.ক্লার ও এস.জে. বল-রোকেশ (অনুবাদ ঃ আফতাব হোসেন)

একক ৪ □ গণমাধ্যম

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ প্রস্তাবনা

৪.২ গণজ্ঞাপনের প্রকৃতি

৪.৩ গণমাধ্যমের প্রভাব

৪.৪ শ্রোতৃমন্ডলী — ধরন — বৈশিষ্ট্য

৪.৫ শ্রোতা-গবেষণা

৪.৬ গণমাধ্যমের ব্যবহার

৪.৭ গণমাধ্যম ও মেয়েরা

৪.৮ গণমাধ্যম ও পরিবেশ

৪.৯ গণমাধ্যম ও মানবাধিকার

৪.১০ সারাংশ

৪.১১ অনুশীলনী

৪.১২ গ্রন্থপঞ্জী

৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককে গণমাধ্যম এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয় আলোচনা করা হবে। গণমাধ্যমের সূত্র ধরে গণজ্ঞাপনের প্রকৃতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করা যাবে। গণজ্ঞাপনের প্রকৃতির মধ্যে গণমাধ্যমই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গণমাধ্যমের প্রভাবই গণজ্ঞাপনের প্রকৃতির রূপরেখা স্পষ্টভাবে দিতে পারে। সুতরাং গণমাধ্যমের প্রভাবের আলোচনা খুব জরুরি হয়ে পড়ে। প্রভাব যাঁদের ওপর পরে তাঁরা হলেন শ্রোতৃমন্ডলী, তারাই হলেন গণমাধ্যমের লক্ষ্য। তাই শ্রোতৃমণ্ডলীর ওপর আলোচনা দরকার। আরও নানা আনুসঙ্গিক বিষয় যা গণমাধ্যমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে। আলোচ্য বিষয়গুলি হল ঃ

- গণমাধ্যমের প্রভাব
- শ্রোতৃমন্ডলী — ধরন — বৈশিষ্ট্য

- গণমাধ্যমের ব্যবহার
- গণমাধ্যম ও মেয়েরা
- গণমাধ্যম ও পরিষেবা
- গণমাধ্যম ও মানবাধিকার

৪.১ প্রস্তাবনা

সমাজে গণমাধ্যমের প্রভাব বিপুল। যতদিন যাচ্ছে এই প্রভাব ক্রমশ বাড়ছে। প্রভাব কতটা এবং কেমন তার রূপ সেটা জানলেই গণজ্ঞাপনের প্রকৃতি কেমন তা বোঝা যাবে। শ্রোতৃমন্ডলী হল গণজ্ঞাপনক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শ্রোতৃমন্ডলীর ধরন ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হবে। গণমাধ্যমের সঙ্গে যে বিষয়গুলি অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে যুক্ত তার মধ্যে অন্যতম হল, পরিষেবা ও মানবাধিকার। মেয়েদের বিষয় নিয়ে গণমাধ্যম কী কাজ করছে সেটা জানলে গণমাধ্যমে সামগ্রিক রূপ ভালোভাবে জানা যাবে। তাই এ সম্পর্কে আলোচনা থাকবে।

৪.২ গণজ্ঞাপনের প্রকৃতি

গণজ্ঞাপনের প্রকৃতি বুঝতে গেলে গণমাধ্যমের আলোচনা খুবই প্রাসঙ্গিক। গণজ্ঞাপন ক্রিয়া বাস্তবায়িত হয় গণমাধ্যমের মাধ্যমে। নির্দিষ্ট সামাজিক পরিমন্ডলের মধ্যে গণজ্ঞাপন কীভাবে সংঘটিত হচ্ছে সেটা বুঝতে গেলে গণমাধ্যম কী কাজ করছে সেটা আগে জানতে হবে।

গণজ্ঞাপন সবসময়ই যন্ত্রনির্ভর মাধ্যমের দ্বারা বাস্তবায়িত হয়। গণজ্ঞাপন বার্তাকে পৌঁছে দেয় বিপুল শ্রোতৃমন্ডলীর কাছে। একই সময়ে বহু মানুষের কাছে পৌঁছতে গেলে যন্ত্রের ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। খবরের কাগজের জন্য চাই মুদ্রণযন্ত্র, বেতার বা টেলিভিশনের জন্য চাই আধুনিক, প্রযুক্তি নির্ভর সম্প্রচার ব্যবস্থা যা সম্পূর্ণভাবে যন্ত্রনির্ভর। গণজ্ঞাপনের বার্তা হবে নৈর্বক্তিক। বহু মানুষের কাছে একই বার্তা গ্রহণীয় হয় এই নৈর্বক্তিকতার জন্য। বহু মানুষের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয় বার্তাকে। ধরে নেওয়া হয় এই বার্তা বহু মানুষের কাছে উপযোগী বলে গৃহীত হবে। গণজ্ঞাপনের প্রকৃতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল গণজ্ঞাপনের বার্তা তৈরি হয় পরিকল্পিতভাবে। ভেবে চিন্তে সময় নিয়ে পরিকল্পিত বার্তা পাঠিয়ে দেওয়া হয় বৃহৎ শ্রোতৃমন্ডলীর কাছে। এই শ্রোতৃমন্ডলীর ওপর এই বার্তা কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করে এবং কীভাবে তাঁরা প্রভাবিত হয় তা জানা গেলে গণজ্ঞাপনের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা অনেক পরিষ্কার হবে।

৪.৩ গণমাধ্যমের প্রভাব

গণমাধ্যমের গুরুত্ব বিচার করতে গেলেই প্রভাবের বিষয়টি অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। প্রতিটি গণমাধ্যমেরই লক্ষ্য শ্রোতা রয়েছে। সংবাদপত্রের পাঠক, বেতারের শ্রোতা ও টেলিভিশনের দর্শক হল এই লক্ষ্য শ্রোতা। যে সমস্ত মানুষ গণমাধ্যমের বার্তা নিয়মিত গ্রহণ করছে তাঁরাই হল গণমাধ্যমের লক্ষ্য শ্রোতা। যে সমস্ত বার্তা গণমাধ্যম দিচ্ছে তার দ্বারা লক্ষ্য শ্রোতারা কম বেশি প্রভাবিত হচ্ছে। বার্তা কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে তা জানতে পারলেই প্রভাবের বিষয়টি বোঝা যাবে। প্রভাব শুধুমাত্র যে পাঠকদের ওপর হচ্ছে তাই নয়, সমাজের বিভিন্ন অংশের ওপরই প্রভাব পড়ছে বিভিন্ন মাত্রায়।

সংবাদপত্র সমাজের ওপর যে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে তা ঐতিহাসিকভাবে সত্য। হরিশ মুখার্জির হিন্দু প্যাট্রিয়ট নীল আন্দোলন নিয়ে তৎকালীন সমাজকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি জনমানসে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল। বর্তমানেও নির্বাচনের সময় সংবাদপত্রের তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব উপলব্ধি করা যায়।

১৯৩০ সালে হিটলারের বেতার বক্তৃতা শুনে জার্মানরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বযুদ্ধের সময় চার্চিলের বেতার বক্তৃতা ব্রিটেনের মানুষকে সাহস ও আস্থা জুগিয়েছিল। পরাধীন ভারতে নেতাজী সুভাষ বসুর গোপন বেতার বার্তার জন্য মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত। ঐ বার্তা পরাধীন ভারতের মানুষকে দেশাত্মবোধের প্রেরণা জোগাত। সাধারণ মানুষের মধ্যে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে বেতার। যারা পড়তে পারে না তাঁরাও বেতার অনুষ্ঠান শুনে উপভোগ করতে পারে। ভারতের মতো দেশে যেখানে নিরক্ষরতা ও দারিদ্রতা এক বিরাট সমস্যা সেখানে বেতারের মতো গণমাধ্যম খুবই উপযোগী। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ও নিরক্ষর গ্রামবাসীর কাছেও পৌঁছে যেতে পারে বেতার। পরিবার পরিকল্পনার বার্তা, ন্যূনতম স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার নির্দেশ পাঠিয়ে জনজীবনে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে।

টেলিভিশন আসার পর জনজীবনে গণমাধ্যমের প্রভাব এক নতুন মাত্রা পায়। টেলিভিশনের অনুষ্ঠান দেখার জন্যও লেখাপড়া জানতে হবে এমন কোন কথা নেই। নিরক্ষর মানুষও টেলিভিশন দেখে উপভোগ করতে পারে। দৃশ্য ও শ্রাব্য মাধ্যম হিসেবে মানুষের কাছে টেলিভিশনের আবেদন রয়েছে। কথায়, ছবিতে, হুবহু জীবন যেরকম তার চিত্রায়নে টেলিভিশন সমস্ত গণমাধ্যমের চেয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। মানুষের মনে, চিন্তায় ও আচরণে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। দেহ, মন আচ্ছন্ন হয়েছে ছোটপর্দার যাদুতে। ম্যাকলুহানের কথায় মাধ্যম নিজেই বার্তা হয়ে উঠেছে (medium is the message)। মানুষের মধ্যে ভোগপ্রবণতা, উচ্চাকাঙ্খা বাড়িয়ে তুলেছে।

প্রথমদিকে গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা মনে করতেন মানুষের আচার আচরণে গণমাধ্যমের প্রভব খুবই সামান্য। ১৯৪০ সালে পল লাজারসফেল্ড (Paul Lazarsfeld) এবং বার্নাড বেরেলসন (Bernard Berelson) অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেন মানুষের আচরণের ওপর গণমাধ্যমের প্রভাব খুবই সামান্য। তাঁরা দেখেছেন আগে থেকেই মানুষের মনের মধ্য যে সব ধারণা রয়েছে তাকেই কেবলমাত্র পরিপুষ্ট করছে গণমাধ্যম। যেমন কোন বিষয়ের প্রতি মানুষের যদি বিরূপতা থাকে, তবে ঐ বিরূপতা বাড়িয়ে দিতে পারে গণমাধ্যম। গণমাধ্যমের এই স্বল্প প্রভাবকে তাঁরা minimul effects বলে অভিহিত করেছিলেন।

বর্তমানে গণমাধ্যমের প্রভাব কিন্তু এই minimul effects-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। টেলিফোন আসার পর এই প্রভাব বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭০ সালের পর থেকে গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞদের মনোযোগ গণমাধ্যমের প্রভাবের ওপর পড়েছে। তাঁরা দেখেছেন মানুষের আচরণে, বিশ্বাসে এমনকি ব্যক্তিগত অনুভবেও গণমাধ্যমের প্রভাব রয়েছে। মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক সচেতনতা তৈরি করতে গণমাধ্যম তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও সাম্প্রতিক কালে কম্পিউটার নির্ভর ইন্টারনেট ব্যবস্থা মানুষের আচরণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

সামাজিক প্রভাবের মধ্যে অন্যতম হল ভোগবাদের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করা। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ও টেলিভিশন পণ্য সংস্কৃতির প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ও টেলিভিশনে প্রচারিত বিজ্ঞাপন মানুষের মধ্যে তীব্র আকাঙ্খাবোধ তৈরি করে। বিজ্ঞাপিত পণ্যের জন্য সৃষ্টি হয় চাহিদা। বিজ্ঞাপন দেখে মানুষ যেমন বিচিত্র পণ্যসম্ভার সম্পর্কে অবহিত হচ্ছে, তেমনি পণ্য কেনবার জন্য মানসিক দিক থেকে প্রভাবিত হচ্ছে। এভাবেই ভোগবাদের প্রসারে বিজ্ঞাপন সাহায্য করছে।

শুধু বিজ্ঞাপন নয়, গণমাধ্যমে পরিবেশিত বিষয়বস্তুর মধ্যেও এমন বিষয় থাকছে যা মানুষকে উৎসাহিত করছে ভোগবাদের প্রতি আকৃষ্ট হতে। ফ্যাশান, খাওয়াদাওয়া, আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর প্রাত্যহিক কাজের সরঞ্জাম নিয়ে বহু লেখা প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে ও সাময়িকপত্রে। এই সব রচনার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে মানুষের মধ্যে। টেলিভিশনের যেসব অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় তার মধ্যেও থাকে ভোগবাদের উৎসাহিত হবার মালমশলা। দৃশ্যও শ্রাব্য মাধ্যমের যাদুর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলে যায় মানুষের মনে। মানুষের মনের মধ্যে তৈরি হয় আরো ভালভাবে বেঁচে থাকার ইচ্ছে। জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করার বাসনা জাগ্রত হয়। গণমাধ্যমের কাছ থেকেই মানুষ পেয়েছে উন্নতজীবনযাত্রার সূত্র। ক্রমাগত ফ্রিজের বিজ্ঞাপন দেখতে দেখতে ফ্রিজ কেনার ইচ্ছে জাগাটা খুবই স্বাভাবিক।

গণমাধ্যম জনশিক্ষায় প্রসার ঘটিয়ে সমাজ জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সংবাদপত্র ও টি.ভি. স্বাস্থ্যবিধি, পরিবার পরিকল্পনা, পরিবেশ রক্ষা প্রকৃতি বিষয়ে রচনা ও অনুষ্ঠান প্রচার করে সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করে তোলে। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতেও গণমাধ্যমের ভূমিকা রয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মূল্যবোধের যোগ রয়েছে। টি.ভি. সিরিয়াল মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধকে প্রভাবিত করে। বিশেষ করে শিশুদের ওপর টেলিভিশন বিপুল প্রভাব বিস্তার করছে। অ্যাকশন ও ভায়োলেন্সের বাড়াবাড়ি শিশুমনে গভীর প্রভাব ফেলে। শিশুর স্বাভাবিক আচরণ বিকাশের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় বিভিন্ন গবেষণায় এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৪.৪ শ্রোতৃমন্ডলী — ধরণ — বৈশিষ্ট্য

শ্রোতৃমন্ডলী ঃ

গণজ্ঞাপনে বার্তা যাঁদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয় তাঁরাই হল শ্রোতৃমন্ডলী। গণজ্ঞাপন প্রক্রিয়ায় শ্রোতৃমন্ডলী হল অন্যতম উপাদান। গণজ্ঞাপনের আলোচনায় শ্রোতৃমন্ডলীর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। বিপুল মানুষের সমষ্টি হল এই শ্রোতৃমন্ডলী। অনেক জ্ঞাপনবিদ মনে করেন শ্রোতৃমন্ডলী হল একটি বিমূর্ত ধারণা। কারণ শ্রোতৃমন্ডলীকে সহজে চিহ্নিত করা যায় না। জ্ঞাপনক্রিয়া যখন ঘটছে সেই সময় শ্রোতৃমন্ডলীকে বোঝা খুব কঠিন। নানান ধরণের মানুষ এই শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে রয়েছে। কারা কখন গণজ্ঞাপন ক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছে তা সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয় না। অনেকটাই অনুমানে ধরে নিতে হয়।

শ্রোতৃমন্ডলী গড়ে ওঠে এক সামাজিক প্রেক্ষিতে। সমাজে প্রচলিত সাংস্কৃতিক ভাবনা, বোঝাপড়া, অভ্যাস, ভাষা ও তথ্যের চাহিদা যে প্রেক্ষাপট তৈরি করে তারই মধ্য থেকে উঠে আসে শ্রোতৃমন্ডলী। এর কোন সার্বজনীন রূপ নেই। মাধ্যম অনুযায়ী একেক ধরনের শ্রোতৃমন্ডলী তৈরি হয়। আবার একই মাধ্যমের শ্রোতৃমন্ডলীর মধ্যেও ফারাক থাকে।

ধরণ ঃ

শ্রোতৃমন্ডলীকে বুঝতে হলে অনেকগুলি বিষয় বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে। বিষয়গুলি হল স্থান, বিভিন্ন ধরণের মানুষ, মাধ্যম, বিষয়বস্তু ও সময়। স্থান দিয়ে বোঝা যাবে শ্রোতৃমন্ডলীর অবস্থান কোথায়। আঞ্চলিক মাধ্যমের শ্রোতৃমন্ডলী ও জাতীয় মাধ্যমের শ্রোতৃমন্ডলী একরকম হবে না। স্থান অনুযায়ী শ্রোতৃমন্ডলীর চরিত্রও পাল্টে যায়। দ্বিতীয়, শ্রোতৃমন্ডলীর মধ্যে থাকে বিভিন্ন ধরণের মানুষ। মেয়েরা একধরণের শ্রোতা, আবার পুরুষরা হল আরেক ধরণের শ্রোতা। বয়েস এবং আয় অনুসারেও শ্রোতৃমন্ডলীর চরিত্র বদলে যায়। অল্পবয়েসী ছেলেমেয়ে

এবং বয়স্ক মানুষদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। অল্পবয়েসী ছেলেমেয়েদের চাহিদা ও বয়স্ক মানুষের চাহিদা একরকম হবে না। বয়েসের তারতম্যের কারণে শ্রোতৃমন্ডলীর ধরণ আলাদা হয়।

মাধ্যম অনুসারেও শ্রোতৃমন্ডলীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আবার সংবাদপত্রের চরিত্রও শ্রোতৃমন্ডলীর মধ্যে পার্থক্য নিয়ে আসে। সিরিয়াস সংবাদপত্রের পাঠক ও পপুলার সংবাদপত্রের পাঠক একইরকম হয় না। টেলিভিশন চ্যানেল অনুযায়ী ও শ্রোতৃমন্ডলীর চেহারা একেক রকম হয়। বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস এবং এম.টি.ভির দর্শক একই ধরনের হয় না।

বিষয়বস্তুর জন্যও শ্রোতৃমন্ডলীর চরিত্রে তারতম্য দেখা যায়। একই সংবাদপত্র এবং টেলিভিশন চ্যানেলের নানারকম শ্রোতৃমন্ডলী থাকতে পারে। আনন্দবাজার পত্রিকার পাঠকদের মধ্যেও বিভাজন রয়েছে। সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার পাঠক এবং খেলার পাতার পাঠাক একধরণের হয় না। টেলিভিশন চ্যানেলও অনুষ্ঠান অনুযায়ী দর্শকদের চরিত্র আলাদা হয়। একটি চ্যানেলে বহু অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। সিরিয়াল যে দেখে সে হয়তো সংবাদধর্মী অনুষ্ঠান দেখে না। একইভাবে সংবাদধর্মী অনুষ্ঠানের দর্শক হয়তো নিয়মিত সিরিয়াল দেখে না।

সময় অনুসারেও টেলিভিশনের দর্শক আলাদা হয়। প্রাইম টাইমের দর্শক আর অন্য সময়ের দর্শক একরকম হয় না। একইভাবে দৈনিক পত্রিকার পাঠক এবং বিষয় কেন্দ্রিক সাময়িকপত্রের পাঠকের চরিত্র আলাদা হয়।

বৈশিষ্ট্য ঃ

শ্রোতৃমন্ডলীর কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য বৈশিষ্ট্যগুলিও পরিবর্তিত হয়। বর্তমানে শ্রোতৃমন্ডলীর যে বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল ঃ

(১) স্বেচ্ছাহীন শ্রোতৃমন্ডলী
(২) সাধারণ বিষয়কেন্দ্রিক শ্রোতৃমন্ডলী
(৩) বিশেষ বিষয়কেন্দ্রিক শ্রোতৃমন্ডলী
(৪) স্থান ও অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক শ্রোতৃমন্ডলী।

১) স্বেচ্ছাধীন শ্রোতৃমন্ডলী ঃ

নিজেদের ইচ্ছে ও পছন্দমত বিষয়ের প্রতি তাঁরা আকৃষ্ট হন। সংবাদপত্র পড়ার সময় কোন বিষয় পড়বেন, টেলিভিশন দেখার সময় কী তাঁরা দেখবেন সেটা সম্পূর্ণভাবে তাঁদের ইচ্ছাধীন। স্বাধীনভাবে তাঁরা ঠিক করবেন কোন বিষয় পড়বেন অথবা কোন অনুষ্ঠান দেখবেন।

২) সাধারণ বিষয়কেন্দ্রিক শ্রোতৃমন্ডলী ঃ

শিক্ষা, বিনোদন এবং মানসিক আগ্রহের বিষয় জানার জন্য, উপভোগ করার জন্য মানুষ সংবাদপত্র পাঠ করে এবং টেলিভিশন অনুষ্ঠান দেখে। এগুলি হল সাধারণ বিষয় যা সমস্ত গণমাধ্যমেই পরিবেশিত হয়। এই বিষয়গুলির জন্য নির্দিষ্ট শ্রোতৃমন্ডলী থাকে, যাঁরা গণমাধ্যমে তাঁদের অভীষ্ট বিষয়গুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়।

৩) বিশেষ বিষয়কেন্দ্রিক শ্রোতৃমন্ডলী ঃ

বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জন্য আলাদা শ্রোতৃমন্ডলী থাকে। খেলাধূলার পত্রিকার পাঠক একরকম, আবার বাণিজ্য বিষয়ক পত্রিকর পাঠক আরেকরকম হয়। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শ্রোতার সঙ্গে পপ্ গানের শ্রোতার পার্থক্য রয়েছে।

৪.৫ শ্রোতা-গবেষণা

গণজ্ঞাপনে গবেষণা করে জানতে হয় শ্রোতৃমন্ডলীর চরিত্র। গণমাধ্যমে মধ্য দিয়ে যে বার্তা শ্রোতৃমন্ডলীর কাছে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে তা কীভাবে কাদের কাছে কীভাবে গৃহীত হচ্ছে সেটা জানা জরুরী। এটা জানতে না পারলে গণমাধ্যম তার কার্যধারাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারবে না। বার্তার সার্থকতা জানতে গেলে শ্রোতৃমন্ডলীর পরিচয় জানতে হবে। বিপুল জনসমষ্টির মধ্যে শ্রোতারা লুকিয়ে আছে। বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে তাঁদের খুঁজে বার করতে হয়। যে উদ্যোগের মাধ্যমে শ্রোতৃমন্ডলীকে খুঁজে বার করার চেষ্টা হয় তারই নাম গবেষণা।

এই গবেষণা গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান নিজ উদ্যোগে করতে পারে। আবার কোন শ্রোতা গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে করতে পারে। সংবাদপত্র জানতে পারে কারা পাঠক এবং তাঁরা কীভাবে দেখছে সংবাদপত্রটিকে। টেলিভিশনের চ্যানেলও গবেষণা চালিয়ে জানতে পারে কারা তাদের দর্শক এবং চ্যানেলের অনুষ্ঠান দর্শকদের কেমন লাগছে। গবেষণা চালিয়ে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান যে বিষয়টি জানে তার দুটি দিক আছে। এক, কে শ্রোতা সেটা জানা যায়। দুই, মাধ্যমে পরিবেশিত বার্তা কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে তার পরিচয়ও পাওয়া যায়। প্রথমটি থেকে জানা যায় কী ধরনের মানুষ গণমাধ্যমের শ্রোতা, তাঁদের আর্থিক সামাজিক অবস্থান কী। দ্বিতীয়টি থেকে জানা যায় গণমাধ্যমের পরিবেশিত বিষয়ের সার্থকতা। যদি শ্রোতাদের খারাপ লাগে তাহলে গণমাধ্যম বিষয়টি নতুনভাবে গঠন করতে পারে।

বিজ্ঞাপনদাতারাও গবেষণা থেকে প্রভূত সাহায্য পায়। প্রতিটি বিজ্ঞাপনদাতাই চায় তাদের দেওয়া বিজ্ঞাপন লক্ষ্য শ্রোতার কাছে গিয়ে পৌঁছাক। লক্ষ্য শ্রোতার কথা বিবেচনা করেই বিজ্ঞাপনদাতা মাধ্যম নির্বাচন করে। বিজ্ঞাপন দেবার পর বিজ্ঞাপন-বার্তা কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে সেটা জানাও দরকার। তাহলেই জানা যাবে বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপনদাতার কাঙ্খিত বাজার তৈরি করতে পারবে কিনা। যদি বিজ্ঞাপনদাতা জানতে পারেন যে প্রচারিত বিজ্ঞাপন সেভাবে কার্যকরী হচ্ছে না, তাহলে বিজ্ঞাপনটিতে পরিবর্তন ঘটিয়ে পুণরায় প্রচার করতে পারে। বিজ্ঞাপনকে সফল করতে হলে শ্রোতৃমন্ডলীর গবেষণা খুবই প্রয়োজনীয়।

শ্রোতৃমন্ডলীর গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হল ঃ

১) শ্রোতৃমন্ডলীর রুচি-পছন্দ জানা
২) বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যের পরিমান করা
৩) শ্রোতৃমন্ডলীর বাজার অনুসন্ধান করা
৪) পণ্যের সার্থকতা যাচাই করা
৫) শ্রোতৃমন্ডলীর চাহিদা মিটছে কিনা জানা
৬) মাধ্যমের সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ণ করা

গবেষণা চালানো হয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে। বাজার সমীক্ষা করার জন্য বেশ কিছু সংখ্যাতত্ত্ব ভিত্তিক পদ্ধতি রয়েছে। প্রশ্নমালা তৈরি করে প্রতিনিধিত্বমূলক শ্রোতৃমন্ডলীর কাছে গিয়ে অনুসন্ধান চালানো হয়। শ্রোতার আর্থ-সামাজিক অবস্থান জেনে নিয়ে প্রশ্ন রাখা হয়। শ্রোতার দেওয়া উত্তরগুলি পরে পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করে জানা যায় শ্রোতৃমন্ডলীর সঠিক প্রতিক্রিয়া।

৪.৬ গণমাধ্যমের ব্যবহার

গণমাধ্যমের আলোচনায় গণমাধ্যমের ব্যবহারের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশনের সংস্পর্শে মানুষ আসে এই মাধ্যমগুলির উপযোগিতা আছে বলেই। কী উদ্দেশ্যে কখন কীভাবে গণমাধ্যমকে ব্যবহার করছে মানুষ সেটা জানলে গণমাধ্যমের সামাজিক ভূমিকা আরও ভালোভাবে জানা যাবে। গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা